বিশ্ব-নারী-প্রগতি

শ্রীসরোজ নাথ ঘোষ
"যমুনাধারা", "শতগল্প গ্রন্থাবলী", "রূপের মোহ"
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

সেলিং এজেণ্টস—
গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস
২৯।১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

আধুনিকা ইংরেজ তরুণী

ইংলণ্ডের নারী

ইংলণ্ড সমগ্র ইউরোপের মধ্যে অত্যন্ত রক্ষণশীল দেশ হইলেও, গঠন কার্য্যে বৃটিশ জাতি অগ্রগামী। বৃটিশ জাতি ভাঙ্গিবার পক্ষপাতি নহে, কিন্তু গঠন কার্য্যে তাহাদের উদাসীনতা নাই। ইহাই বৃটিশ জাতির বৈশিষ্ট্য।

ইংলণ্ডে নারী-বিপ্লব অন্যান্য দেশের অনেক পরে দেখা দিয়াছিল। "সফরাজিষ্ট" আন্দোলন বা নারী বিদ্রোহ যখন ইংলণ্ডে প্রথম দেখা দিয়াছিল, তখন একদল লোক তাহাতে বাধা প্রদান করিলেও, মনীষী ইংরেজগণ তাহার প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। তাই নারীর অধিকার ইংলণ্ডে এখন অব্যাহত।

ইংলণ্ডের middle class বা মধ্য শ্রেণীর নরনারীই দেশের ও জাতির মেরুদণ্ড। এই মধ্য শ্রেণীর ইংরেজ ললনারা দেশের যাবতীয় কার্য্যে অগ্রণী। অবশ্য অভিজাত বংশের ঘরণীরাও ইদানীং দেশের কল্যাণ কার্য্যে সমধিক অগ্রসর।

ইংরেজ পুরুষ, নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু নারীর জন্য এত অধিক

সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আমেরিকা ব্যতীত অন্য কোনও দেশে আছে বলিয়া জানা নাই।

ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দরিদ্র মধ্যশ্রেণীর নারীরা শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীলা। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার আগ্রহ অনেকদিন হইতেই ইংলণ্ডের নারী সমাজে দেখা দিয়াছে। অলস জীবন যাপনে কাহারও আগ্রহ মাত্র নাই।

সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনের বিবিধ প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডে প্রচুর আছে। তাহা ছাড়া নানাবিষয়ক শ্রমশিল্প এবং বিবিধ প্রকার কার্য্য শিখিয়া আত্মনির্ভরশীলা হইবার জন্য এত অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডে আছে, যাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

হিসাবনবিশী শিক্ষা, কৃষিকার্য্য ও বাগিচার কাজ, গৃহপালিত পশুপক্ষির কাজ, হাঁসের ব্যবসা, মৌমাছি পালন ও তাহার চাষ প্রভৃতি শিক্ষা করিবার বিবিধ প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের বিবিধ স্থানে দৃষ্ট হইবে। ওষধিচয়ন, গন্ধসার প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিবার প্রতিষ্ঠানও অনেক আছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান নারীর দ্বারা পরিচালিত।

ইংলণ্ডে নারীপরিচালিত শুশ্রূষাকেন্দ্র এত অধিক সংখ্যক যে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। রোগীর পরিচর্য্যা, পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা, কি করিয়া পথ্য প্রস্তুত করিতে হয়, রোগীকে কি উপায়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইলে তাহার কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না, এই সকল বিষয়, বৈজ্ঞানিক হিসাবে নারীদিগকে শিখান হইয়া থাকে।

প্রসূতি মন্দির সম্বন্ধে ইংরেজের যত্ন অপরিসীম। ধাত্রী বিদ্যায় যে সকল ইংরেজ ললনা শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের দক্ষতা ও সেবাপরায়ণতা দেশবিদেশে খ্যাত। ইংলণ্ডের মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলি সমগ্র ইউরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বহু

সংখ্যক নারী-চিকিৎসক মেয়েদের নারী-চিকিৎসালয় হইতে প্রতিবৎসর বাহির হইয়া আসেন।

ইদানীং নারীরা ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানেই পুরুষদিগের সহিত বিদ্যার্জ্জন করিবার অধিকারিণী। চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষা দিবার যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, লণ্ডন, এডিনবরা, ডাব্লিন, এবার্ডীন, ডারহাম, বৃষ্টল, লীড্‌স ম্যাঞ্চেষ্টার, গ্যালওয়ে, সেফিল্ড, কার্ডিফ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রসিদ্ধ। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বহু নারী পুরুষেব সহিত সহশিক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ইংলণ্ডে নারীশিক্ষার প্রসার প্রচুব পরিমাণে হইয়াছে। স্বাধীন দেশের নরনারী জাতীয় উন্নতির দিকে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। সে জন্য মনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উন্নতি সাধনের দিকেও ইংলণ্ডের ঝোঁক কম নহে। নারীদেহ যাহাতে নীরোগ, কর্ম্মক্ষম এবং বলিষ্ঠ থাকে, সে জন্য বিবিধ শারীরিক ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতির দিকেও ইংরেজ ললনাদিগের আগ্রহ অত্যধিক। টেনিস্, স্কেট প্রভৃতি নানা জাতীয় ক্রীড়ায় নারীদিগের পারদর্শিতা অল্প নহে। মোটর প্রভৃতি চালনায়ও অধিকাংশ নারীই (অবশ্য তাঁহারা বিশিষ্ট ধনী-গৃহিণী বা দুলালী) সিদ্ধহস্তা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ললনারাও এ বিষয়ে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

বিমান পরিচালনার কার্য্যেও ইংরেজ-ললনা পশ্চাৎপদ নহেন। সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের দিকে ইংলণ্ডের নারীর আগ্রহ এই বিংশশতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অশ্বারোহণ, দ্বিচক্রযান

পরিচালন, নৌকাবিহারে দাঁড়টানা—সকল প্রকার ব্যায়ামেই ইংরেজ-ললনারা আগ্রহশীলা।

সহরের ইংরেজ-ললনা ও পল্লীর ইংরেজ-তনয়াদিগের মধ্যে ব্যবহারগত পার্থক্য আছেই। সহরের নারী সমাজ পুরুষের যাবতীয় কার্য্যে বর্ত্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। যাবতীয় আপিসের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সকল ব্যাপারেই ইংরেজ ললনারা অগ্রবর্ত্তিনী। নারী-ব্যবহারাজীব, নারী-চিকিৎসক, নারী-বিমানবিদ—বহুল সংখ্যায় ইংলণ্ডে দেখা যাইবে। বিংশশতাব্দীর প্রগতিযুগে ইংলণ্ডের নারী সমাজ এখন আর অবলা নহেন। তাঁহারা প্রবলা ত বটেনই, বরং তাঁহাদের সহিত পুরুষ অনেক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় পরাস্তও হইতেছেন।

এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডের নারীর সহিত, ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজ ললনাকুলের যে পার্থক্য ছিল, বর্ত্তমান যুগের নারীর সহিত ভিক্টোরিয়া যুগের নারীর পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক অধিক।

বর্ত্তমানযুগে সহরের ললনাকুল বেপরোয়াভাবে জীবনযাত্রার সকল পর্য্যায়ে দ্রুত চলিয়াছেন। পূর্ব্বে নারীরা ধূমপান করিতেন না। মহিলার সম্মুখে ধূমপান সে যুগে নিদারুণ অসভ্যতার দ্যোতক ছিল। ধূমপানের ইচ্ছা হইলে পুরুষকে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া, ভিন্ন কক্ষে ধূমপান করিতে হইত। এমন কি রেলগাড়ীতে পর্য্যটনকালেও স্বতন্ত্র ধূমপানের কক্ষ ছিল। বর্ত্তমান যুগে সে বালাই নাই। কারণ, এখন ইংরেজ ললনারা স্বচ্ছন্দে প্রচুর চুরুটিকা সেবন করিয়া থাকেন।

ইউরোপের মহাযুদ্ধের পর হইতে বসন-ভূষণেও বর্ত্তমান যুগের নারীরা ভিক্টোরিয়া যুগের নারীদের আদর্শ ত্যাগ করিয়াছেন এখন হাঁটু পর্য্যন্ত স্কার্ট উঠিয়াছে। গায়ের বডিস বা ব্লাউস

এখন ইংরেজ ললনার কুক্ষিদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া রাখে। বক্ষোদেশের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত আবৃত থাকিলেই যথেষ্ট। বস্ত্রের প্রাচুর্য্য ও বাহুল্য এ যুগের ইংরেজ নারীর কাছে ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

সহরের নারী সমাজ অশোভন লজ্জার ধার ধারেন না। তাঁহারা সপ্রতিভ বাকচটুলা এবং সাহসিকা। সঙ্কোচ বা লজ্জার মাত্রা তাঁহারা হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সুদূর পল্লীর ইংরেজ তনয়ারা ঠিক তাহা নহেন। সহরের আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিলেও, পল্লীর মহিলাকুল এখনও সঙ্কোচ ও লজ্জাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে পারেন নাই। পল্লী ললনাদিগের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠা, ঈশ্বর পরায়ণতা, ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ এখনও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। উপযাচিকা বৃত্তি তাঁহাদের মধ্যে বিরল। সংযম ও শালীনতার জ্ঞান পল্লী রমণীদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও এখনও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

ডিকেন্স, স্কট, ডিসরেলী প্রভৃতি ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণের রচনায় ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী ইংরেজ তনয়াগণের যে চিত্র পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে তাহার রূপান্তর দৃষ্ট হইলেও, এখনও নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ নারীরা সরলতার আদর্শ-ভ্রষ্ট হয় নাই। তাহাদের সহজাত ঈশ্বরপরায়ণতা ও ঈশ্বরে নির্ভরশীলতার পরিচয় এই বিংশশতাব্দীর প্রগতিযুগেও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দয়া, মায়া, অতিথিসৎকার প্রবৃত্তি এযুগেও পল্লীর নিম্ন শ্রেণীর অর্দ্ধশিক্ষিত নারী সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লীনারী—মধ্যবিত্ত ও নিম্ন সম্প্রদায় হইতে—জীবিকার্জ্জনের জন্য, বড় বড় সহরে এযুগে অধিক সংখ্যায় গমন করিয়া থাকে। তাহাদের সরলতা ও সংসারজ্ঞান সম্বন্ধে অভাববশতঃ, অনেক

চক্রান্তকারী, তাহাদিগকে সহজে কুপথে পরিচালিত করিয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক সহরে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নারী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুগের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে যেমন বিশ্বের নানা উপকারও করা যায়, ,আবার তেমনই মানবের অকল্যাণকর বহু কার্য্যও মতলববাজ ধূর্ত্তদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য বর্ত্তমানযুগে কোন কোন ভ্রান্তপথচালিতা নারীও এই সকল চক্রান্তবাজ নরপিশাচদিগের দলেও ভিড়িয়া যায়। তাহাদের চেষ্টায় সরলা পল্লী তরুণীদিগের সর্ব্বনাশও সহজে সম্পাদিত হয়।

এই প্রকার অনেক অকল্যাণকর অত্যহিত ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার পর পল্লীর নারীসমাজেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।

বিবাহ ব্যাপারে ইংরেজ ললনারা সাধারণতঃ মামুলী প্রথারই অনুগামিনী। ইংলণ্ড অত্যন্ত রক্ষণশীল দেশ। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে স্বয়ংবরা হইবার ব্যবস্থা থাকিলেও, পল্লীর নারীরা সাধারণতঃ পিতৃ-মাতৃনির্দ্দেশানুসারেই পতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। ধরাবাঁধা এমন কোনও বিধি ব্যবস্থা নাই যে, পিতামাতার নির্দ্দেশ ব্যতীত বিবাহ হইবে না। কিন্তু সুদূর পল্লীতে পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমোদন লইয়া তরুণীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সহরে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম বহুল পরিমাণেই দেখা যাইবে। ইংরেজ ললনারা সাধারণতঃ ইংরেজ বরই পছন্দ করিয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় পাত্রের সহিত বিবাহেও কোন বাধা নাই। তবে বিবাহক্রিয়া ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে সম্পাদিত হওয়া চাই। বিবাহের ঘটনা রেজেষ্ট্রী বহিতে থাকা চাই। বর ও কন্যা স্বাক্ষর ত করিবেই—অন্যান্য সাক্ষীও তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। পূর্ব্বরাগ ব্যতীত সাধারণতঃ ইংলণ্ডে বিবাহ হয় না।

আইনে বিবাহের বয়স ইদানীং নারীর পক্ষে ১৫।১৬ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে সাধারণতঃ ঐ বয়সে সহরের মেয়েরা বিবাহ করে না। কিন্তু পল্লীতে এইরূপ বহু কিশোরীর বিবাহ এ যুগেও হইয়া থাকে। বিবাহ ব্যাপারটা ইংলণ্ডের নারীর কাছে ছেলেখেলা নহে। স্বামীর সহিত সদ্ভাবে জীবন যাপন করার দিকে সাধারণ ইংরেজ নারীর বিশেষ লক্ষ্য আছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকিলেও, আইন খুবই কড়া। এজন্য পূর্ব্বের তুলনায় বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বর্ত্তমান প্রগতিযুগে বৃদ্ধি পাইলেও, পল্লী অঞ্চলে ইহার নিদর্শন অত্যন্ত অল্প। বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্না নারী বর্ত্তমান যুগেও সমাজে শ্রদ্ধার আসন সহসা লাভ করিতে পারে না। ব্যভিচারিণী নারী এযুগেও ইংরেজ সমাজে ঘৃণিতা।

উচ্চঘরণী, অভিজাত বংশের কোন কোন নারীর কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, সাধারণ ইংরেজ মহিলারা—উচ্চ, মধ্য নিম্ন সকল শ্রেণীরই—গৃহসংসারের যাবতীয় কায্য স্বয়ং পয্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। রন্ধন, গৃহের অন্যান্য কার্য্য, সন্তান পালন, স্বামীর পরিচর্য্যা—সকল বিষয়েই ইংরেজ ললনাদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রশংসনীয়। নিয়মানু-বর্ত্তিতা বাল্যকাল হইতেই ইহারা রপ্ত করিয়া থাকেন। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা ইংরেজ নারীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমোদ-প্রমোদ, থিয়েটার-বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও গৃহধর্ম্মের প্রতি সাধারণতঃ কেহ উদাসীন নহেন।

ইংরেজ নারীর আর একটা বৈশিষ্ট্য স্বজাতি প্রীতি। স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি ইহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ। বিদেশে গিয়াও ইংরেজ নারী স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মমত্বহীন হন না। এমনও দেখা

গিয়াছে যে, বিদেশে বসবাস কালে, ইংরেজ মহিলা স্বদেশীদের দোকান হইতে অধিক মূল্য দিয়াও দ্রব্য ক্রয় করিবেন, তথাপি সেই জিনিষ বিদেশীর দোকানে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে পাইলেও গ্রহণ করিবেন না।

প্রগতিশীল যে সকল দেশ বিংশশতাব্দীতে দেখা যায়, তন্মধ্যে ইংলণ্ড অন্যতম। ইংলণ্ডের নারী সমাজ নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য বর্ত্তমান যুগে কৃতসঙ্কল্প। নারী সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ, ইহা ইংলণ্ডের নারী—শিক্ষিতা নারী কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিবে।

সুইডেনের নারী

সুইডেন বালটিক সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্বাধীন দেশ। সুইডেন-বাসীরা জমি ও তাহার উৎপন্ন পণ্যের একান্ত ভক্ত। প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ এক একার পরিমিত জমি থাকিলেই সেথানে নারীরা স্বামীর সহিত শাকসব্জী উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা প্রত্যেক নারীর নিত্যকর্ম্ম। শুধু শস্য নহে, নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষের দ্বারা ক্ষেত্রগুলি মনোরম ভাবে সজ্জিত থাকে।

গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ ভাগে প্রত্যেক পরিবারের গৃহিণী উদ্যানজাত শস্য সংগ্রহে মন দিয়া থাকেন। স্বামী বা গৃহের কর্ত্তাও তাহাতে যোগ দেন। আগষ্ট মাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রত্যেক পরিবার তাঁহাদের শ্রমজাত শস্য ও পুষ্প-সম্ভারসহ টাউনহলের বিরাট নীল কুঠিতে সমবেত হইয়া থাকেন। এই শস্য ও পুষ্প প্রদর্শনী জাতীয় উৎসব মধ্যে পরিগণিত।

সুইডেন নারী পরিচ্ছন্নতার একান্ত ভক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলি স্বাস্থ্যের একান্ত উপযোগী। বিশুদ্ধ নির্ম্মল বায়ু এবং পুষ্পের সুগন্ধ স্বাস্থ্যের একান্ত উন্নতিকারক ইহা প্রত্যেক সুইডিস নারী জানেন।

পুত্রের ন্যায় পুত্রীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সুইডেনবাসীরা জানে। এদেশে ৬ বৎসর বয়স হইতে ছাত্র ও ছাত্রীর শিক্ষার জীবন আরম্ভ হয়। ধনীদরিদ্র অভিজাত ও কৃষক নির্ব্বিশেষে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

শীতকালে কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে ছাত্র ও ছাত্রীগণকে বেশভূষা করিতে হইয়া থাকে। রাজপথের আলোক নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। পৌনে ৮টায় ক্লাশের পাঠ আরম্ভ হয়। পৌনে ১১টায় সকলে প্রাতরাশের, জন্য গৃহে ফিরিয়া আসে। তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া পাঠারম্ভ করে। ২টা ৩৫মিনিট বা সাড়ে ৩টায় বিদ্যালয়ের ছুটি হয়। শীতের মাঝামাঝি সময়ে অপরাহ্ন কালেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আইসে।

প্রথম তুষার পাত আরম্ভ হইলেই ছাত্র ও ছাত্রীরা "স্কী" সহযোগে বিদ্যালয় অভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকে। ৬বৎসর বয়স্কা ছাত্রীও স্কী ব্যবহারে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

সুইডেনের ছাত্রীরা মার্কিন ছাত্রীদিগের তুলনায় পাঠাভ্যাসে অধিক মনোযোগ দিয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের অবকাশকালে তাহাদের মত কোনদেশের ছাত্রীই বাহিরের ক্রীড়ায় অধিক অনুরাগ প্রকাশ করে না। অপেক্ষাকৃত ধনীর দুলালীরা নগরের বহির্ভাগ-স্থিত গ্রীষ্মাবাসে অবসর যাপন করিবার জন্য পিতামাতার সহিত গমন করিয়া থাকে।

সুইডেনের সামাজিক জীবনে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুষদিগের ন্যায় সুইডেনের কোনও নারী বিনা নিমন্ত্রণে কোনও গৃহস্থগৃহে গমন করে না। উচ্চ মধ্য নিম্ন—সকলশ্রেণীর মধ্যেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত। টেলিফোন যোগে কোনও নারী কোনও নারী-বন্ধুকেও একথা বলে না যে, সে তাহার গৃহে বেড়াইতে যাইবে। বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইলে তবে পুরুষের ন্যায় তথায় গমন করিয়া থাকে।

সুরাপানপ্রথা নিমন্ত্রণ সভায় থাকিলেও, নারীরা বর্ত্তমান যুগেও একবিন্দু সুরা নিমন্ত্রণ সভায় পান করিবে না। ভোজ শেষে মহিলারা

কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে গৃহস্বামীকে মধুর ও সুন্দর ভাবে একটি বক্তৃতা করিতে হয়। স্থইডেনে নারীর সম্মান প্রচুর।

শিষ্টাচার স্থইডেনে প্রচুর। "ট্যাক" বা ধন্যবাদজ্ঞাপক শব্দ প্রত্যেক ব্যাপারের পর উচ্চারণ করিতে হয়। স্থইডেনের পুরুষদিগের ন্যায় নারীরাও এই শিষ্টাচার পালন করিয়া থাকে। ধনী বা দরিদ্র, অভিজাত বংশীয় বা কৃষক বলিয়া কোনও পার্থক্য নাই।

গৃহস্থগৃহে ভোজনের পর প্রত্যেক পুত্র ও কন্যা পিতামাতাকে ধন্যবাদজ্ঞাপনসূত্রে বলে, "মা, তুমি প্রচুর খাদ্য দিয়াছ সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।" পিতার সম্বন্ধেও সন্তানরা ঐ কথাই বলিবে। এই ধন্যবাদজ্ঞাপন গতানুগতিক ভাবে উচ্চারিত হয় না। আন্তরিকতার সহিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

পুষ্পপ্রীতি স্থইডেন নরনারীর প্রকৃতিগত। গ্রীষ্মকালে অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ গ্রীষ্মাবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন স্থইডেন নারীরা প্রত্যহই একবার করিয়া ফুলের বাজারে তীর্থ যাত্রা করেন।

স্থইডেনের নরনারী শান্তির ভক্ত। যুদ্ধের প্রতি আসক্তি কাহারও নাই। মানবপ্রেমের দিকে স্থইডেনের পুরুষ দিগের যেমন অনুরাগ, নারীরাও সেইরূপ। স্থইডেনের অধিবাসীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ। শতকরা ৯৯ জনই স্বদেশে বসবাস করে। পুরুষরা স্বদেশকে যেমন ভালবাসে, স্থইডেন নারীও তেমনই। দেশাত্মবোধ স্থইডেন নরনারীর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহাদের সঙ্গীতে শুধু দেশমাতৃকার গান। স্থইডেন গায়িকা নারীরা সে গান গাহিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে।

স্থইডেন সংস্কার পন্থী—ধ্বংস পন্থী নহে। জাতির কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সংস্কারকার্য্য সাধিত হয়। এ জন্য বর্ত্তমান

যুগের প্রগতিবাদ সুইডেনে সার্থক হইতে পারে নাই। সুইডেন নারীরা রক্ষণশীলা, আচারে, ব্যবহারে তাহারা মার্কিণ বা প্যারী নারীর আদর্শ গ্রহণ করে নাই। পরিধেয় বসন শালীনতা রক্ষার জন্য পরিকল্পিত। অসমগ্রবসনা সুইডিস নারী দেখা যাইবে না।

সুরাপান প্রথা সুইডেনের জাতীয় আচারে পরিণত হইলেও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সুরা বিক্রয়ের এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, কোনও পুরুষ মাসে ৮ পাঁইটের অতিরিক্ত সুরা ক্রয় করিতে পারিবে না। আর সেই পানীয় সুরায় শতকরা ২২ ভাগের অধিক সুরাসার কখনই থাকিবে না। অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদিগের সম্বন্ধে বিধান আরও কঠোর। তাহাদিগকে উহার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ সুরাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রত্যেক ক্রেতা নরনারীর কাছে একখানা করিয়া ছাপান ফরমের বই থাকে। প্রথম বোতল ক্রয়ের রসিদ সহ দ্বিতীয় বারের আবেদনপত্র দোকানে পাঠাইতে হইবে।

জীবনকে উপভোগ করা সুইডেনের নরনারীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। কি পুরুষ কি নারী, কেহই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতি নহে। তাহারা প্রশান্তভাবে, সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত।

ধর্ম্মবিশ্বাস সুইডেনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরোপাসনা প্রত্যেক পরিবারে নিত্য কর্ম্ম। ধর্ম্ম মন্দিরে নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকেই গমন করে।

বিবাহ ব্যাপারে নারী স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালিত করে না। পিতামাতা ও অভিভাবকগণের অনুমোদনক্রমে মনোনীত পাত্রে তরুণীরা আত্মসমর্পণ করে। বিবাহবিচ্ছেদ আইন থাকিলেও কদাচিৎ তাহা ব্যবহৃত হয়।

সুইডেনের নরনারীরা সাধারণতঃ রুসদিগের ন্যায় বহুভাষাবিদ। জীবনের উচ্চতম মাপকাঠি সুইডেনে যেমন দেখা যায়, তেমন অন্যত্র দুর্ল্লভ।

দাম্পত্যজীবন সুইডেনে সাধারণতঃ সুখের এবং উচ্চাঙ্গের। ঐশ্বর্য্যের মোহ সুইডিস নরনারীর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে না। যৌন সমস্যা এদেশে আদৌ প্রবল নহে।

নরওয়ের মেয়ে

নরওয়ে প্রাচীন দেশে। পূর্ব্বে ইহা সুইডেনের অধীন ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে উহা স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর সমান দান আছে। নরওয়ের লোক সংখ্যা ২৫ লক্ষ।

প্রতীচ্যের দেশসমূহের মধ্যে নরওয়ে নরনারীরা সর্ব্বাপেক্ষা উদার মতাবলম্বী। জগতের অগ্রগতির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ট পরিচয় আছে। আধুনিকতার বিশেষ ভক্ত হইলেও নরওয়ের নরনারীরা কোনও বিষয় নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে না। সংরক্ষণ প্রণালীতে সমাজের কাজে তাহারা অবহিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা দেখে, যদি কোনও নূতন মতবাদ তাহাদের সভ্যতার বিরোধী না হয়, তবে নূতন হইলেও তৎক্ষণাৎ সে মতবাদকে তাহারা সাদরে বরণ করিয়া লয়।

নরওয়ে খৃষ্টান দেশ। লুথারীয় ধর্ম্মমত এখানে প্রচলিত। নরওয়ের নরনারীরা গণতন্ত্রের ভক্ত। সাম্যবাদ তাহাদের মধ্যে প্রবল। পরিশ্রম সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন নরওয়েতে আদৌ নিন্দনীয় নহে। সম্ভ্রান্ত মহিলারাও অর্থোপার্জ্জনের জন্য অন্যবিধ কাজ করিয়া থাকেন। পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী অথবা অন্যপ্রকার সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীরা প্রসাধন সংক্রান্ত দোকানে প্রসাধিকার কাজ করিতে কুণ্ঠিতা

নহেন। একবার কোনও মার্কিণ মহিলা নরওয়ে গমন করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের বলনৃত্যে তিনি আমন্ত্রিতা হন। কেশপ্রসাধনের জন্য তিনি কোনও প্রসাধিকার দোকানে গমন করেন। প্রিয়দর্শনা, মিষ্ট-ভাষিণী প্রসাধিকা তাঁহার প্রসাধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেন। উক্ত মার্কিণ মহিলা নৃত্যাগারে পূর্ব্ব পরিচিতা, প্রসাধিকাকে দেখিয়া বিস্মিত হন। প্রসাধিকা তখন স্বামীর বাহু অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পরিচয়ে মার্কিণ মহিলা জানিতে পারেন, উক্ত প্রসাধিকা কোনও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর সুশিক্ষিতা পত্নী। গণতন্ত্রবাদী নরওয়েতে এরূপ কার্য্য আদৌ অপ্রশংসার নহে।

সভ্য জীবন যাপন করিতে গেলে যে ভোগবিলাসী হইতে হইবে, ইহা নরওয়েবাসী নরনারীর প্রকৃতিতে দেখা যাইবে না। নরওয়ের পুরুষ বা স্ত্রী কেহই বিশ্বাস করে না যে, সভ্যতার সহিত বিলাসিতার কোনও সংস্রব আছে।

নারীর অধিকার সম্বন্ধে নরওয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তথায় যে কোনও নারী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিলেই ধর্ম্মমন্দির ও কূটরাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত, রাজ্যের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান ও কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। নরওয়ের কবি হেন্‌রিক উইলিয়ম্ বারজেলাণ্ডএর সহোদরা জ্যাকোবাইন্ ক্যামিলা কলেট্ যখন "গবর্ণরস ডটার" বা শাসকের দুহিতা নামক উপন্যাস রচনা করেন, সেই সময় হইতেই নারীর অধিকার লইয়া নরওয়েতে সংগ্রাম আরব্ধ হয়।

অন্যান্য দেশের ন্যায় নরওয়ের সমাজেও নারী ও পুরুষের চরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাট্যকার Bjornson রচিত "A Gauntlet" প্রকাশিত হইবার পর ভীষণ

আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। Bjornson দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব যেরূপ আদর্শ, পুরুষের পক্ষেও তদ্রূপ। ব্যভিচার করিলে নারীর দোষ ঘটে, পুরুষেরও সমান অপরাধ ও পাপ হয়। তিনি দৃঢ়তার সহিত পাণিপ্রার্থী-যুবকদিগকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তাহাদের অতীত জীবন নিষ্কলঙ্ক কি না? সেই সময় হইতেই পুরুষেরও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ও উহা রক্ষার জন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হইয়াছিল।

নরওয়েজীয় নারীরা স্বল্পবসনা নহেন। তাঁহারা চরিত্রবতী এবং গৃহকর্ম্ম-নিপুণা। ধনী এবং দরিদ্র সকল গৃহের নারীই স্বামী ও ও সন্তানগণের প্রতি আসক্তা। ধর্ম্ম জীবনের প্রতি অনুরাগ পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমান ভাবেই প্রবল।

শিক্ষার বিষয়েও নরওয়ের নারীরা পশ্চাতে পড়িয়া নাই। নর ও নারী যেমন সরল স্বভাব, তেমনই সহৃদয়। নরওয়ের পুরুষরা সচ্চরিত্র এবং সাধুস্বভাব। এ জন্য জারজ সন্তানের সমস্যা সহর বা পল্লী কোথাও নাই। নারীরা স্বহস্তে খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ধনীর দুলালীরাও এসম্বন্ধে অবহিত।

পুরুষদিগের ন্যায় নরওয়ের অনেক নারীও বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন। নরওয়ে দেশে একপ্রকার চক্রহীন শ্লেজ গাড়ী আছে। তুষারের উপর দিয়া ঐ গাড়ী চড়িয়া নর ও নারীরা ভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ গাড়ীর নাম "জেল্‌কি"। নরওয়ের নারীরাও উহা পরিচালনে বিশেষ নিপুণা।

নরওয়ের প্রত্যেক কুমারী নৌকায় চড়িয়া দাঁড় টানিতে পারে। তাহারা এই ভাবে কাহারও সাহায্য না লইয়া নৌকায় নদী পার হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন নরওযের অধিবাসী। তাঁহার রচনা নরওয়ের নরনারীরা সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকে। সকলপ্রকার প্রগতিবাদ এদেশে থাকিলেও সংযত চরিত্রা নরওয়ে নারীরা বিলাসিনী বা প্রমোদিনী নহে। গৃহসংসার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান তাহাদের মজ্জাগত। মিঃ মরিস্ ফ্রান্সিস ইগান্ দীর্ঘকাল এই দেশে বাস করিয়া নরওয়ে-বাসীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "নরওয়েবাসী নরনারীর মতের দৃঢ়তা আছে, আত্মপ্রত্যয় আছে। বিশেষ বিবেচনার পর তাহারা সংকল্প স্থির করিয়া থাকে। একবার কোনও বিষয়ে ধারণা জন্মিলে, সে মত কি নারী কি পুরুষ, সহজে পরিবর্ত্তন করে না। তাহাদের আর একটা গুণ আছে, অন্যের মতের উপর নিজেদের মত চালায় না।"

বিবাহ প্রথা অন্যান্য খৃষ্টান দেশের মতই এখানে প্রচলিত। বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন ব্যাপারে অভিভাবকদিগের মতই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বরাগ বিবাহ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বর বন্ধুবান্ধব সহ কন্যার গৃহে বিবাহ করিতে আইসে। পিতামাতা বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। তাহার পর ধর্ম্মমন্দিরে যাইতে হয়। ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ-বন্ধনকে দৃঢ় রাখাই ব্যবস্থা। ধর্ম্মমন্দির অভিমুখে বর-কন্যা যখন গমন করে, তখন বাদ্য-যন্ত্র সহ বাদকদিগের মিছিল বা শোভাযাত্রা সঙ্গে চলিতে থাকে। ধর্ম্মমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিমন্ত্রিতা নারীদিগকে ভোজ দিবার প্রথা বিদ্যমান। বিবাহ বিচ্ছেদের আইন আছে বটে, কিন্তু উহার প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে। ধর্ম্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল বলিয়া কি পুরুষ, কি নারী বিবাহবন্ধন ছেদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না।

পোল্যাণ্ড নারী

পোল্যাণ্ড অধুনা গণতন্ত্রশাসিত দেশ। উহার রাজধানী ওয়ার-শ। পোল্যাণ্ডের নারীদিগের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে। পোলগণ নৃত্য-বিদ্যায় জগতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। একদা পোল্যাণ্ড নারীরা স্বহস্তে পশম বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিত। কিন্তু ইদানীং সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

রুসিয়ার শাসনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পোল্যাণ্ড এখন অগ্রগতির পথে ধাবিত। কিন্তু উইল্‌নো নগরের বড় বড় অভিজাত বংশ এখনও মধ্যযুগের জমিদারদিগের ন্যায় জীবন যাপন প্রণালীর পক্ষপাতী। সে জন্য আধুনিকতার ছাপ এখানকার নরনারীদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে এখানে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বিত হয়। তৎপূর্ব্বে পোল্যাণ্ড পৌত্তলিক ছিল। এখন খৃষ্টধর্ম্মানুসারেই এখানে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উইলনো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়। নব-জাগ্রত পোলগণ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ইদানীং পোল নারীরা আবার বিদ্যার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পোল সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত নগরগুলির মধ্যে—পোজনান্ অত্যন্ত

অগ্রসর হইয়াছে। এই স্থানের নারীরা বিদ্যাচর্চ্চায় সমধিক যত্নবতী।

দীর্ঘকাল পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকার ফলে পোল্যাণ্ডের নরনারী সকল বিষয়েই জীবন্মৃত হইয়াছিল। ইদানীং তাহারা নব-জীবনে উদ্বুদ্ধ হইলেও সকল বিষয়ে তাহাদের উদ্বোধন হয় নাই।

বিবাহবিচ্ছেদ আইন এখানে প্রচলিত থাকিলেও, কেহই উহার পক্ষপাতী নহে। ধর্ম্মের প্রভাব পোল নরনারীর জীবনে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। বিবাহ ব্যাপারেও পিতামাতার নির্ব্বাচনেই তরুণীদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। নারী এখানে স্বেচ্ছাচারিণী নহে। তাহারা গার্হস্থ্য জীবনেই সুখী। স্বামি-পুত্রের সেবা নারীর চরম কাম্য। নৃত্যগীত প্রভৃতি ব্যাপারে পোল্যাণ্ডের নারীরা পারদর্শিনী। অবাধ মেলামেশার রীতি পোলদিগের মধ্যে নাই। পোল নরনারীরা দেশাত্ম-বোধে অনুপ্রাণিতা।

জেবি অঞ্চলের নারীরা দীর্ঘাকার—দৈর্ঘ্য প্রায় প্রত্যেকেরই ছয় ফুট হইবে। ইহাদের শারীরিক গঠন ও বর্ণ-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। আরবদিগের ন্যায় পোল নারীরা মাথায় বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিতে ভালবাসে। পোলনারীদিগের পরিধেয় বস্ত্র শুধু বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল নহে—রুচিকর। অঙ্গে শুভ্র ব্লাউজ—কারুকার্য্যবর্জ্জিত। নারীরা লজ্জাশীলা হইলেও সপ্রতিভ। অনাবশ্যক সঙ্কোচ তাহাদের ব্যবহারে দেখা যায় না।

পোল্যাণ্ডের নারী অন্যান্য প্রগতিবাদী দেশের ন্যায় জীবনের নানা পর্য্যায়ে এখনও প্রাধান্য লাভ করে নাই। সেরূপ প্রচেষ্টা এখনও তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। অনেক বিষয়ে অগ্রগামিনী হইলেও, সংযম ও শালীনতা তাহাদের জীবনে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের পর পুরুষরা যেমন জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত, নারীর মধ্যেও সেই ভাব সংক্রামিত হইয়াছে।

পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ লেখক সায়ানকিয়েজের প্রভাব এখানকার শিক্ষিত নরনারীর মনে বেশ প্রবল। বিলাসিতার ভক্ত তাহারা নহে। অথচ স্বরুচি ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ অনুরাগিণী।

ডেনমার্ক নারী

ডেনমার্কের নারীরা সাধারণতঃ পুরুষের সমকক্ষ—লেখাপড়া, বুদ্ধি সকল বিষয়েই তাহারা উচ্চস্তরের অন্তর্গত। বিগত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ডেন নারী বিস্ময়জনক ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। পুরুষ, নারীর অগ্রগতিতে কিছুমাত্র বাধা দিবার চেষ্টা করে নাই। বরং সকল বিষয়েই পুরুষ নারীর সহায়তা করিয়াছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুরুষ নারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অন্যান্য কলেজও নারীর শিক্ষার জন্য যাবতীয় বাধা বিঘ্ন সরাইয়া লইয়াছিল। শুধু শিক্ষাব্যাপারে নহে, জীবন যাত্রার বিভিন্ন পর্য্যায়ে ডেনিস্ নারী আজ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। কোন তরুণী—ধনিগৃহের অথবা দরিদ্রগৃহেরই হউক না কেন, স্বোপার্জ্জনশীলা হইবেই। শুধু বড় বড় কার্য্যে নহে, নানাবিধ আপিসের কাজেও নারী তাহার স্থান করিয়া লইয়াছেন।

নারীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের ইউনিয়ন বা সঙ্ঘ সংগঠন করিয়াছেন। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিতা, তাঁহাদিগের সহিত অল্প শিক্ষিতা নারীর ভাববিনিময় এবং বান্ধবতার ফলে নারী সমাজ ডেনমার্কে আজ বেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।

ডেনমার্কে—কলেজে পুরুষ ও নারী ছাত্র একসঙ্গে বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকে—ক্লাবগৃহেও মেলামেশা অবাধে চলে। তবে সংযম সেখানে

বিদ্যমান। কেহ কাহারও সহিত ফ্লার্ট করিবে সে ব্যবস্থা নাই। ক্লাবগৃহে নারীর যোগদানের ফলে পুরুষের সুরাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা হ্রাস পাইয়াছে। জুয়াখেলারও প্রচলন বন্ধপ্রায়। শুধু নারীরা ক্লাবে মিশিবার পরে ধূমপান করিতে শিখিয়াছেন।

ডেনিস্ নারীরা সাধারণতঃ আমোদপ্রিয় এবং সুভাষিণী। গ্রাম্য বা পল্লী অঞ্চলের নারীরা গৃহস্থালীর কাজ, যথা রন্ধন, সন্তানপালন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন।

পুরাতন প্রথা ডেনমার্কে হ্রাস পাইতেছে। সেই সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

ডেন নারী এখন আপনাকে পুরুষের অধীন বলিয়া না ভাবিলেও স্বৈরাচারের পক্ষপাতিনী নহেন। স্বামীর প্রতি সেবা-যত্ন, সন্তান পালন এসকল ব্যাপারে নারীর আগ্রহ অল্প নহে। বিবাহব্যাপারে স্বয়ংবরের ঘটা থাকিলেও, পিতামাতার অনভিমতে প্রায়ই কোন বিবাহ হয় না। বিবাহ বিচ্ছেদ খৃষ্টান ধর্ম্মের একটা অঙ্গ, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ সাধারণতঃ ঘটে না। বিদূষী নারীরাও ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

হল্যাণ্ড নারী

ইউরোপের কোনও স্থানের নারী সমাজের সহিত হল্যাণ্ডের তুলনা চলে না। হল্যাণ্ডের ললনাকুল গৃহসংসারকেই কামনার স্বর্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। গৃহসংসারে তাহারাই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পুরুষ জাতি নারীর মূল্য ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া, কোনও দিনই নারীর অধিকারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নাই।

হল্যাণ্ডকে সাগরমেখলা বলা যায়। এজন্য হল্যাণ্ডের নামও সাগর কন্যা। এ বৈশিষ্ট্যও বৈচিত্র্য সকল স্থানে নাই।

যাঁহারা হল্যাণ্ডের নারী সমাজের সকল সংবাদ রাখেন এবং হল্যাণ্ডের নারী সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, এরূপ বিশেষজ্ঞ লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মার্কিন মহিলাদিগের ন্যায় হল্যাণ্ডের নারী বিলাসিনী ও আত্মম্ভরী নহে। স্প্যানিশ ও ইতালী নারীরা যেরূপ 'মোহিনী কুহকিনী' হল্যাণ্ডের মাতৃজাতি সেরূপ নহে। ফরাসী নারী গৃহসংসারে স্বামীর অংশী-দার, কিন্তু হল্যাণ্ড নারী তাহা নহে। রুসিয়ার নারী স্বামীসহচরী, হল্যাণ্ড নারী তাহা নহে। হল্যাণ্ড নারী-সমাজ স্বামীর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী, দেশের কল্যাণময়ী জননী। সন্তানের পরম বন্ধু।

হল্যাণ্ড দেশটি একাদশটি প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জাতিতে, ধর্ম্ম ও ভাষায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ডাচ বা ওলন্দাজ জাতি, ফ্রিজিয়ান্, জিলাণ্ডার, হল্যাণ্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নর নারী লইয়া গঠিত। বিভিন্ন জাতির আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য প্রচুর। ফ্রিজল্যাণ্ডের নারীরা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গী সুকেশা। তাহাদের নয়নের মণি নীলাব্জ নীল, সুন্দর।' ব্রাবাণ্ট নামক অঞ্চলের নারীরা সুদর্শনা, প্রগলভা এবং হাস্য কৌতুকময়ী। হল্যাণ্ডার জাতীয় নারীরা দেখিতে স্থূলকায়া, কেশরাজি কোমল ও মসৃণ নহে, পাটের মত দেখিতে। আমষ্টার্ডামের ললনাদের দেহে ফরাসী রক্তের মিশ্রণ আছে। তাহারা যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই হাস্যস্ফুরিতাধরা। হল্যাণ্ডার জাতীয় নরনারীকে দেখিয়া একজন সুরসিক ইংরেজ লেখক যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, এই জাতীয় পুরুষ দিগের চরণাভাব। স্ত্রীর কটিদেশ নাই বলিলেই চলে। ছোট ছোট মেয়েদের জানুর অভাব। হল্যাণ্ডনারীর চক্ষু কটা গাত্রবর্ণ শ্যামাভ। স্প্যানিশ নারীদিগের সহিত ইহাদের অনেকটা সামঞ্জস্য দেখা যায়।

মধ্য হলাণ্ডের নারীরা অত্যন্ত সামাজিক। তাহাদের অনুরাগ অত্যন্ত অধিক। স্বামীর প্রতি মধ্য হল্যাণ্ডের নারীর ভক্তি অপরিসীম। সঞ্চয়ী বলিয়া তাহাদের প্রসিদ্ধিও আছে। বেশ ভূষায় পরিচ্ছন্নতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। সপ্তাহে একদিন গৃহের যাবতীয় ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি, শয্যাস্তরণ, পর্দ্দা সবই কাচিবার জন্য পুষ্করিণীতে লইয়া যায়। বৃষ্টির দিনেও একার্য্য বন্ধ থাকে না, মাথায় ছাতা ধরিয়া বস্ত্র ধৌত করার ব্যবস্থা আছে। পরিচ্ছন্নতার দিকে নারীদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। দাস দাসীর উপর ভার দিয়া নিজে এ বিষয়ে উদাসীন থাকে না।

হাটে বা বাজারে গেলে হল্যাণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণী

নারীর বেশ ভূষায় বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। শুধু বেশ ভূষা নহে—আচার ব্যবহারেও প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান।

হল্যাণ্ডের পুরুষ জাতি নারীদিগের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ লইয়া কাজ করিয়া থাকে। পুরুষ ও নারীর এই অন্তরঙ্গ ভাব অন্যত্র দুর্ল্লভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, হল্যাণ্ডের পুরুষ জাতি বিশ্বাস করে না। স্ত্রী সহকর্ম্মিণী এবং সহধর্ম্মিণী বলিয়া প্রত্যেক ব্যাপারে, এমন কি রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, জন সাধারণের সকল প্রকার ব্যাপারে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া পুরুষজাতি কাজ করিয়া থাকে।

একজন খ্যাতনাম ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "The most important and far-reaching decisions taken by Dutch statesmen in the olden times were directly inspired by their wives." অর্থাৎ পুরুষ রাষ্ট্রনীতিকগণ, তাঁহাদের পত্নীর পরামর্শ অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহার ফল বহুদূর প্রসারী হইত।

এখনও পুরুষজাতি সকল বিষয়েই পত্নীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ওলন্দাজরা স্প্যানিশ অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রামের পর তাহারা স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে। সে সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, এই বিভীষণ ও বিপুল সংগ্রামে ওলন্দাজ নারীর বুদ্ধিকৌশল অপূর্ব্ব ফল প্রদান করিয়াছিল।

ফ্রীজল্যাণ্ডের গাভী প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। এজন্য দুগ্ধের ব্যবসায় এ অঞ্চলে খুব ভাল চলে। মেয়েরা স্বহস্তে দুগ্ধ দোহন

করিয়া থাকে। দুগ্ধ হইতে পনীর, মাখম ও অন্যান্য ভোজ্য এবং পানীয় নারীরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা হইতে প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে ।

ফুল হল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রবিবারে টিউলিপ ফুলের উৎসব হইয়া থাকে। তখন গ্রামে গ্রামে মেলার উৎসব আরম্ভ হয়। নারীরা ফুলের যোগাড় করিয়া থাকে। প্রচুর পুষ্প নানা দেশে চালান যায়। তাহাতে অজস্র অর্থ উপার্জ্জিত হয়। এই ফুলের বেসাতিতে নারীরই প্রাধান্য। তাহারা স্বহস্তে ফুলের গাছ রোপণ করে, স্বহস্তে গাছের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। পুরুষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।

সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী গ্রামগুলির অধিবাসীরা মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। পুরুষের সহিত নারীরাও এই মৎস্য ধরিবার কার্য্যে সমুদ্রপথে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। মাছ লইয়া নৌকাগুলি তীরে ভিড়ায়, মাছের পসরা মাথায় লইয়া বাড়ীর মেয়েরা হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম হইয় থাকে।

হল্যাণ্ডে মদের ভাঁটি প্রচুর আছে। জিন মদ্য ও নানাবিধ স্পিরিট জাতীয় জিনিষ এই সকল ভাঁটিখানায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল সুরা ও সুরাসার দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এই ব্যবসায়ে নারীরা অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে কাজ করিয়া থাকে। আমষ্টার্ডমে হীরক ও মণিমাণিক্য সংক্রান্ত কার্য্য হইয়া থাকে হীরাকাটার কাজে ইহুদী নারীদিগের নিপুণতা অসাধারণ।

ডাচ জাতির মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষার প্রচলন অধিক নহে। কিন্তু

শিল্পকলায় ইহাদের নিপুণতা প্রশংসনীয়। ডাচ নারীরা প্রকৃতিদত্ত শক্তিতে শিল্পী।

ওলন্দাজ নারীরা যেমন পরিশ্রমী তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অনুরাগিণী। গৃহসংসার—ঘরদ্বার সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা যেন তাহাদের ব্রত। এখানকার নারীজাতির ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাহারা স্বর্গ আছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসী। ইহ সংসারে যেমন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আছে, ওলন্দাজ নারীরা বিশ্বাস করে, পরজগতে, ভগবান তাহাদের জন্য ঘর সংসার রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানেও এমনই ভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম করিয়া তাহাকে সময় যাপন করিতে হইবে। এই নিষ্ঠা, বিশ্বাসের জন্য যৌন সমস্যার জটিলতা ওলন্দাজ নারীদিগের মধ্যে দেখা যায় না। ইহা অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত।

ডাচনারীর জীবনে ধর্ম্ম মন্দিরে গমন ও সংসার ধর্ম্ম পালন ব্যতীত অন্য কোন কামনার বিষয় নাই। তাহারা বিশ্বাসই করে না যে, ইহা ছাড়া নারী জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।

হল্যাণ্ডের বিবাহ ব্যাপার ইউরোপের অন্য দেশের বিবাহ পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। বর স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করিয়া থাকে। কন্যার পিতা যদি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তখন বর নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে কন্যার পিতৃগৃহে আগমন করে। কন্যার সঙ্গে পাণিপ্রার্থী বরেরআলাপ করাইয়া দিয়া পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ সেখান হইতে চলিয়া যান। বর ও কন্যা ঘরের মধ্যে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতে থাকে। পাণিপ্রার্থী বর আসিবার পূর্ব্বে একখানি কেক্ বা পিঠা সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকে। নিভৃত কক্ষে আলোচনা কালে সেই কেক্ খণ্ড সম্মুখস্থ টেবলের উপর সে রাখিয়া দেয়। কন্যা যদি তখন কেক্‌টি কোনও আধারে স্থাপন করিয়া অগ্নির উপর রক্ষা করে তাহা হলে বর

বুঝিতে পারে, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তখন পাণিপ্রার্থী হতাশ মনে স্বগৃহে ফিরিয়া যায়। এই ব্যবস্থা অনাদিযুগ হইতে সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান প্রগতিযুগেও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও উহার সহায়তা সহসা কেহ গ্রহণ করে না।

———

বেলজিয়াম ললনা

আধুনিক বেলজীয় জাতির উদ্ভব কেলটিক ও জার্ম্মান জাতির রক্ত সংমিশ্রণে। দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী এখন বেলজিয়মে দেখা যায়। একশ্রেণীর নাম ওয়ালুন, অপরটির নাম ফ্লেমিং।

উভয় জাতির ভাষা বিভিন্ন হইলেও, তাহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে গিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিতেছে। উভয় জাতিরই ধর্ম্ম এক—রোমান ক্যাথলিক।

লুকসেমবার্গ, লিজ এবং নামুরের নারীরা সুন্দরী বলিয়া পরিচিত। ওয়ালুন ফ্লেমিশ জাতির নরনারীর মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। বিশেষতঃ উভয়জাতির নারীদিগের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ওয়ালুন জাতীয়া নারীরা যেমন বলিষ্ঠা, তেমনই দীর্ঘকায়া। ফ্লেমিশ নারীদিগের দেহে কোমলতা ও লালিত্য সমধিক। ইহাদের দেহের বর্ণ গৌর, কেশ গভীর কৃষ্ণ। ফ্লেমিশ নারীরা স্বভাবতঃ শ্রমনিপুণা। তাহাদের কথাবার্ত্তা ও কর্ম্মে উৎসাহের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইবে।

ওয়ালুনজাতীয়া নারীদিগের ব্যবসায়ী-বুদ্ধি কর্ম্মতৎপরতা প্রচুর। সংসারের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ, রন্ধন প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের পারদর্শিতা প্রশংসনীয়। তবে বেশভূষার ব্যাপারে ওয়ালুন ও ফ্লেমিশ উভয় শ্রেণীর নারীরাই সমানভাবে অনুরাগিণী। রঙ্গীন বসন, পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন সজ্জাতে উভয় জাতীয়া নারীরই সমান আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বেশভূষার স্বরুচির পরিচয় ওয়ালুন জাতীয় নারীর সমধিক পরিমাণে প্রদান করিয়া থাকে।

ছুটীর দিন, ধনিদরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর সকল পর্য্যায়ের নারীই রমণীয় পরিচ্ছদে অঙ্গ সুশোভিত করিয়া ঘরের বাহির হয়। ছুটীর দিন দরিদ্রকন্যারাও অবসর যাপনের মোহ হইতে মুক্তিলাভ করে না। সে দিন দরিদ্রনারীকে দেখিলে সহসা অনুমান করা যাইবে না যে, প্রকৃতই তাহারা দরিদ্র গৃহের ললনা—এমনই বেশভূষায় স্বরুচির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

গৃহস্থালীর ব্যাপারে ধনিদরিদ্র সকল ঘরের তরুণীই প্রায় সমান ভাবে, একই ধারায় চলিয়া থাকে। অভিজাত সম্প্রদায়ই হউক, বড় ব্যবসায়ীই হউক, অথবা সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থই হউক, সকলেরই গৃহস্থালীর ব্যাপার একই ধারায় চলিয়া থাকে। সকলেই মিতব্যয়ী সঞ্চয়ী এবং অনাড়ম্বর।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস সহর অধুনা প্যারীর ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলেই চলে, কিন্তু প্যারী সহরের উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদ বা বিলাসের চিহ্ন বেলজীয় রাজধানীতে পাওয়া যাইবে না। অবশ্য পরিচ্ছদ পরিপাট্যে স্বরুচির পরিচয় সুস্পষ্ট, কিন্তু তাহা দেখিয়া এমন বুঝা যাইবে না, কোন্ কন্যা ধনীর দুলালী, আর কেই বা দরিদ্রললনা।

আর্ডেন এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তী পল্লী সহরেও নারীর পরিচ্ছদে প্যারীর ফ্যাসানের আদর্শ দেখা যাইবে। এনণ্টওয়ার্প এবং জার্ম্মান ডচ্ সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে নারীর বেশভূষায় জার্ম্মান আদর্শ দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরিণতবয়স্কা নারীরা এখনও প্রাচীন পন্থায় সাজসজ্জা করিয়া থাকেন

বেলজিয়মের নারীদিগের বেশে বহু বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইবে। তাঁহাদের দেহ সাধারণতঃ পরিপুষ্ট এবং দৃঢ়। ব্রুসেলসের বিলাসিনী-দিগের দেহের গঠন অনেকটা ফরাসী বিলাসিনীদিগের অনুরূপ। যে সকল নারী কারখানায় কাজ করে অথবা যে সকল বালিকা ও কিশোরী স্কুল কলেজে বিদ্যার্জ্জন করে, তাহাদিগের বেশভূষা ফরাসিনী-দিগের অনুরূপ বলিয়াই বিভ্রম জাগিবে।

কৃষক ললনারা বেশ ও আকৃতিতে নর্ম্মাণ্ডির কৃষকললনাদের অনুরূপ। বেলজিয়ামে বহু পরিবার দুগ্ধের ব্যবসায়ে নিযুক্ত। তাহারা কুকুর-বাহিত ছোট ছোট গাড়ীতে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র লইয়া গৃহে গৃহে সরবরাহ করিয়া থাকে। বাজারেও তাঁহারা বিক্রয়ার্থ দুগ্ধ লইয়া যায়।

অষ্টেণ্ড ও ব্ল্যাকেনবার্গ অঞ্চলে মৎস্যের ব্যবসায়ের প্রাচুর্য্য। এই অঞ্চলের নারীরা সন্তরণ বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ। জলে সাঁতার দেওয়া তাহাদিগের অন্যতম ক্রীড়া। অধিকাংশ সময় তাহারা জল ক্রীড়ার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

বেলজিয়মের নারীরা পরিচ্ছন্নতার ভক্ত। শ্রমিক নারীরা এমনই পরিচ্ছন্ন যে, তাহাদের তুল্য পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় শ্রমিক নারী অন্যত্র দুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই নারীরা সদা প্রসন্নাননা। দ্বেষ হিংসা তাহাদের প্রকৃতি-সুলভ নহে। সর্ব্বদা প্রীতি-প্রফুল্ল মনে তাহারা জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত।

দেশের বাণিজ্যের সহিত বেলজিয়মের নারীদিগের আন্তরিক আকর্ষণ আছে। বহু প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যে তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করিয়া থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যে বেলজিয়ান্ নারীর বুদ্ধি-কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই কারণেই বেলজিয়ম ব্যবসায় বাণিজ্যে জগতে উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছে। বেলজিয়মে

নারীরাই দোকানে পশরা সাজাইয়া ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। মুদির দোকান, ফুলের দোকান, পোষাকের দোকান, সর্ব্বত্রই নারী জাতির একাধিপত্য। দুগ্ধের ব্যবসায়ে নারী ব্যতীত পুরুষ নাই বলিলেই চলে।

বাহিরের কাজে যেরূপ, গৃহেও বেলজিয়ম নারীর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব। রন্ধন কার্য্যে এখানকার নারীদিগের প্রচুর খ্যাতি আছে। পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ার ব্যাপারে গৃহলক্ষ্মীরাই অগ্রগণ্যা। দর্জ্জীর হাতে এ কার্য্যের ভার কদাচিৎ পড়ে। ধনিগৃহের কুললক্ষ্মীরা অবশ্য স্বহস্তে পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ার করেন না বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ধনি-পরিবারেই বেতনভুক সীবনকারিণী দেখা যাইবে।

বেলজিয়মে একটি প্রথা আছে যে, প্রতি বৎসর পিতা বা স্বামীর একবার করিয়া মেয়েদের জন্য নূতন পরিচ্ছদ উপহার দিতে হয়। এই পোষাক দর্জ্জীর দ্বারা প্রস্তুত করাইতে হয়। এই প্রথা ধনি-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বেলজীয় গৃহে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বেলজীয় নারীদিগের সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, নারীই বেলজিয়মের লক্ষ্মী। একজন বিশেষজ্ঞের উক্তি উদ্ধৃত হইল ;—

"The national prosperity of Belgium is largely owing to its women and their many excellent qualities."

বেলজিয়ামে বিবাহই নারী জীবনের চরম আদর্শ। এজন্য কুমারী-বৃদ্ধা সে দেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বেলজিয়াম খৃষ্টান দেশ, সুতরাং ধর্ম্মমতেও সমাদর এখানে খুবই আছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা বিদ্যমান থাকিলেও, কদাচিৎ কেহ বিবাহ বন্ধন ছেদন করিয়া থাকে। যে নারী বিবাহ বিচ্ছেদ করে, নারী-

সমাজে তাহার সম্মান থাকে না। পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া কোনও নারী সমাজে স্থান পাইলেও তাহার ইজ্জতের কোনও মূল্য বেলজিয়মে নাই।

চরিত্র-হীনতা বেলজিয়মে অত্যন্ত নিন্দিত। চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে নরনারীর বিশেষ প্রয়াস লক্ষিত হইবে।

ব্রুসেলস্ নগরের শিক্ষয়িত্রীরা শিক্ষাদান কার্য্যে প্রচুর দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ললিতকলার প্রতি এখানকার নারীদিগের অনুরাগ সমধিক—দক্ষতাও অসাধারণ।

পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলা মেশা বেলজিয়মে নাই। এ জন্য বেলজিয়মের নারীদিগের আচার ব্যবহারে সংযম ও শালীনতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

লেসের কাজ করিয়া বহু নারী প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়া থাকে। আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা—প্রগতিবাদের মোহ বেলজীয় নারীদিগের মনে প্রভাব সঞ্চার করে নাই। টেনিস খেলা, বিমান বা মোটর গাড়ী চালান, চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী হইবার আকাঙ্ক্ষা এখনও বেলজিয়মের নারীদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলে নাই। সেখানকার নারীর আদর্শ, গৃহসংসার এবং ললিতকলার অনুশীলন। সেজন্য বেলজিয়মের গৃহসুখ এখনও অটুট রহিয়াছে।

জার্ম্মাণ নারী

ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার উইলহেলম্‌ নারীত্বের এক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। "K" এই বর্ণ প্রয়োগে তিনি সুন্দরী-দিগের জন্য চারিটি শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই চারিটি শব্দ "কাইণ্ডার," "ক্লেডিয়ার," "কাফি" ও "কুফি"। এই শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থ—শিশু, পরিচ্ছদ, গির্জ্জা এবং রন্ধনশালা। বর্ত্তমানযুগের জার্ম্মাণ তরুণীরা সেই সংজ্ঞা পরিহার করিয়াছে।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর জাতীয় জীবনে বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর মধ্যে অতীত জার্ম্মাণীর অনেক বিষয়ে কোনও অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন সংঘঠিত হয় নাই। মিঃ লিঙ্কলন আয়ার নামক একজন মার্কিণ পণ্ডিত সমগ্র জার্ম্মাণ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন, "আমি ৫ বৎসর বার্লিনে বাস করিয়া দেখিয়াছি অনেক বিষয়ে জার্ম্মাণীকে আর পূর্ব্বরূপে চিনিতে পারা যায় না।" তন্মধ্যে তিনি জার্ম্মাণ তরুণীর পরিবর্ত্তন অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতন্ত্রের আমলে সমগ্র বর্ণমালাই নারীদিগের অধিকার সীমায় আসিয়াছে। কাইজার প্রদত্ত 'K' বর্ণযুক্ত চারিটি শব্দে তাহাদের অধিকার সীমা এখন আর নির্দ্দিষ্ট নাই।

শিক্ষার প্রসার ইদানীং যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তেমনই শারীরিক

শক্তি প্রচেষ্টাও নারী সমাজে প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল কার্য্য নারীর পক্ষে অসম্ভব নহে, তাহাতে নারীরা পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। উচ্চশিক্ষায় জার্ম্মাণ তরুণীরা তরুণদের পশ্চাতে পড়িয়া নাই। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে, শিল্পকলা এবং ব্যবসায়ে নারীরা আপনাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মাণ তরুণীরা পার্ক এভিনিউ, পিকাডিলি প্রভৃতি স্থানের তরুণীদিগের মত খর্ব্বকেশা এবং কস্‌মেটিক, ক্রীম প্রভৃতির দ্বারা মুখরাগ করে সত্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের শ্বেতাঙ্গী তরুণী দিগের তুলনায় ব্যায়ামের বিশেষ অনুরাগিণী। দৌড় ক্ষেত্রে, সন্তরণে ফুটবল ও হকি খেলায় জার্ম্মাণ তরুণীরা সমান উদ্যমে তরুণদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। বিগত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় ১ হাজার জার্ম্মাণ তরুণী যোগ দিয়াছিল। পটস্‌ডাম হইতে বার্লিন পর্য্যন্ত এই দৌড় প্রতিযোগিতায় ৫ হাজার তরুণ প্রতিযোগী ছিল।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যায়াম ক্রীড়ায় জার্ম্মাণীর তিন জন তরুণী ব্যায়াম ক্রীড়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের না হউক, সমগ্র ইউরোপের নারীদিগের মধ্যে এসেনের থিয়ারাকি ২২ বৎসর বয়সে বিমানবিহারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। ক্লেয়ারীসোর ষ্টিনেস্‌ নাম্নী একজন মহিলা মোটরগাড়ী দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সকল নারীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই মহিলা জার্ম্মাণীর হুগোষ্টিনেসের কন্যা। টেনিস ক্রীড়ায় সিলি অসেস্‌ নাম্নী এক ষোড়শী সুন্দরী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীর জাতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক শক্তিশালী দলেই নারী প্রতিনিধি আছেন। মাতৃজাতি ও শিশুদিগের মঙ্গল-

জনক কার্য্যে তাঁহারা বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। সে বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও পর্য্যাপ্ত। ইহাছাড়া তাঁহারা যাবতীয় সাধারণ ব্যাপারেও বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্যারনেস্ ক্যাটিস্কাভ্ন্ ও হিম্ব প্রভৃতি তেজস্বিনী মহিলা সদস্য বাগ্মিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মন্ত্রিসভার কার্য্যেও তাঁহাদের যোগ আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণীতে নারীর ভোটদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কয় বৎসরেই জার্ম্মাণ নারী তাঁহাদের যোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। প্রগতি যুগের ইহা বিস্ময়কর নিদর্শন সন্দেহ নাই।

আইনবিভাগ, চিকিৎসা ব্যবসায় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে বহু নারী যোগ দিয়াছেন। ইদাবয়েড, ফ্রথিয়া ভন্ হার্ব্বো প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রীরা উপন্যাস রচনা করিয়া দেশবিদেশে প্রখ্যাতা হইয়াছেন। কাহারও কাহারও উপন্যাস নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া চলচ্চিত্রে অভিনীত হইতেছে।

ধর্ম্মক্ষেত্রেও জার্ম্মাণ নারীরা প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মযাজকের পদ এখন শুধু পুরুষেরই অধিকৃত নহে। নারী ধর্ম্মযাজিকা, নারী-বিচারক এখন জার্ম্মাণীতে দুর্ল্লভদর্শন নহেন। বার্লিন এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ সহরের মিউনিসিপ্যালিটীতে নারী পুলিস দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাতন জার্ম্মাণীতে নারীর অধিকার এইভাবে বিস্তৃত হওয়া কল্পনারও অতীত বিষয় ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর ভন হিণ্ডেনবার্গের আমলে রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় নারীশক্তি সহসা জার্ম্মাণীতে প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

জার্ম্মাণীর নবীন বংশধরদিগের উপর নারী জাগরণের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে। নারীদলের পুরোবর্ত্তিনীরা মানবের

অনন্ত সীমাহীন যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করিবার জন্য অগ্রসর হইলেও, জার্ম্মাণীর মধ্যবয়স্কা প্রত্যেক গৃহিণী এখনও রন্ধন গৃহের আবেষ্টন ও শিশুপালন ক্ষেত্রের সীমারেখা অতিক্রম করেন নাই। স্ব স্ব দুহিতাদিগের পরিণাম ফল কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা অনেক সময় চমৎকৃত অবস্থায় যাপন করেন।

বিবাহিতা তরুণীরা কিন্তু এখনও স্বামীকে সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। স্বামিসেবা, সন্তান লালনপালন এখনও তাঁহাদের নারীর শ্রেষ্ঠ কার্য্য। জার্ম্মাণ পত্নীরা সেই কর্ত্তব্য পালনে এখনও তৎপর।

নানাদিকে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও, পারিবারিক জীবনে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রীতি, নীতি, ব্যবহার পূর্ব্ববৎই এখনও জার্ম্মাণ পরিবারে প্রচলিত আছে। শুধু কুমারী তরুণীরা এখন নৃত্য গীত সভায় অভিভাবক পরিবৃত না হইয়াও যোগ দিতে যাইতেছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে নারীরা কদাচিৎ বাহিরের কাজে আত্মনিয়োগ করিত। কিন্তু এখন বহুলক্ষ নারী কারখানায় কাজ করিতেছে। যদি ঘটনাক্রমে কাহারও চাকরী যায়, সরকার হইতে পুরুষের ন্যায় সে সাহায্য পাইয়া থাকে।

হিণ্ডেনবার্গের পর হার হিটলার জার্ম্মাণীর কর্ণধার হইয়া নারী-দিগকে আবার রন্ধনশালায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। সনাতন আদর্শের দিকে তিনি নারী জাতিকে ঠেলিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার মতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নারী পুরুষালী কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহার মাতৃত্ব বর্জ্জন করিবে, ইহা হার হিটলারের অভিপ্রেত নহে। তিনি প্রত্যেক নরনারীকে বিবাহবন্ধন

আবদ্ধ হইবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সন্তানের ভার দুর্ব্বহ বলিয়া অনেকে বিবাহ করিতে চাহিত না। হার হিটলার দেখিলেন, ইহাতে জার্ম্মাণীর জনসংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে। তিনি আদেশ দিলেন, ষ্টেট হইতে সন্তানগণের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।। কোনও তরুণ-তরুণী অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে পারিবে না।

কিছুদিন হইতে নাজিশাসিত জার্ম্মাণী সন্তান প্রজনন ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে কোনও উপায়েই হউক না কেন, জার্ম্মাণীর সন্তান চাই, ইহাই নাজিশাসিত জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান নীতি।

ইহার ফলে জার্ম্মাণীতে সম্প্রতি অসংখ্য সন্তানের উদ্ভব হইতেছে। পৃথিবীতে এমন ব্যাপার কোথাও কখনও দেখা যায় নাই।

নাজিসরকার "কম্যুনিজম"কে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া উহার বিতাড়ণের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। অথচ যে কোনও উপায়ে জার্ম্মাণীর সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধিকরা চাই, এইরূপ ব্যবস্থার ফলে যে নীতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা সমাজের কল্যাণের পক্ষে কতটুকু কার্য্যকর তাহা জার্ম্মাণীর কোন কোন মনীষী ইতিমধ্যেই আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হার হিটলার নিজমুখে গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে অতি পবিত্র বলিয়া বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন। দেশবাসী যাহাতে এই পবিত্র ধর্ম্ম পালন করে সেজন্য উদাত্তকণ্ঠে তিনি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অথচ যে কোনও উপায়ে জার্ম্মাণীর সন্তান চাই এই ব্যবস্থার দ্বারা তাঁহার প্রচারিত "পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" ব্যাহত হইতেছে কিনা, তাহা বিবেচনা করিবার ব্যবস্থা নাই দেখিয়া চিন্তাশীল মনীষিগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

যাহারা নাজিশাসিত জার্ম্মাণীতে সন্তান প্রজনন কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের সমগ্র পরিচয় এখনও জনসাধারণে

প্রচারিত হয় নাই। তবে বিশেষ আয়োজনের সহিত জারজ সন্তান প্রজনন—কুমারীদিগের সন্তান প্রসব কার্য্য যে চলিয়াছে, ইহার প্রচারকার্য্য সগৌরবে জার্ম্মাণীতে চলিয়াছে। তবে নাজি সরকার এখনও প্রকাশ্যভাবে এ সকল কথা বলিবার সাহস দেখাইতে পারেন নাই। আইনতঃ সিদ্ধ সন্তান ও জারজ সন্তানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, একথা বলিবার সাহস এখনও নাজি সরকারের হয় নাই। তথাপি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, কুমারী জননী ও জারজ সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য—কুমারীদিগকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য, নাজি সরকার অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

নাজি সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণের কয়েক মাস পরেই, জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলাপাঠ্য পত্রিকায়, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালিকা, দোকানের নারী কর্ম্মী ও গৃহস্থ পরিবারের পরিচারিকাদিগের মধ্যে, কুমারী জীবনে মাতৃত্ব লাভের মহিমা সগৌরবে এবং নিয়মিতভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। এই প্রচার কার্য্যের ভার একজন মহিলা ডাক্তার লইয়াছেন। তিনি আবেগময়ী ভাষায়, নারীজাতির মূল অধিকার সম্বন্ধে, প্রতি সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে বিষয়টির গুরুত্ব কুমারীদিগের মধ্যে অনুভূত হইতে থাকে।

উক্ত মহিলা ডাক্তারের প্রবন্ধবিশেষের কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "সন্তানের জন্মদান নারীর পক্ষে অতি পবিত্র ধর্ম্মকার্য্য ! ইহাতে নারীর নিরবচ্ছিন্ন অধিকার আছে * * * সেই কর্ত্তব্য পালনে উন্মুখতাই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। * * * এই কর্ত্তব্য পালনে পূর্ব্বতন সরকার যে সকল অসঙ্গত ও অন্যায় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনিয়ামক তাহা তিরোহিত করিয়াছেন। * * * যাহারা কারল্ মার্কসের. রচনার দ্বারা

প্রভাবিত, শুধু তাহারাই এই দুশ্চিন্তা করিয়া থাকে যে, কে তাহাদের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? * * * কোনও টিউটন নারী কি কখনও এমন দুশ্চিন্তা মনের কোণেও স্থান দিয়াছে? না। তাহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে অগ্রসর হইয়া দেশকে, জাতিকে বীরসন্তান উপহার দিয়াছে। আজ জার্ম্মাণ নারীকে সেইরূপ দ্বিধাহীন চিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে। * * * তথাকথিত বিবেকবুদ্ধি ভীরুতার নামান্তর মাত্র।"

ভাবাবেগ চালিত মহিলা ডাক্তারের এই প্রকার রচনা প্রভাবের ফলে জার্ম্মাণীর তরুণী কুমারীরা সন্তানজননী হইয়া জার্ম্মাণীর প্রসূতি মন্দির সমূহ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, প্রসূতিগণের অধিকাংশই পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী তরুণী। হার হিটলারের পরোক্ষ প্রচারের ফলেই ইহারা মাতৃত্বকেই জীবনের চরমসার্থকতা মনে করিয়া লইয়াছে। "পবিত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাহাদের নাই।

কুমারী বালিকা জননীদিগের অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে বার্লিন সহরে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু ফলে কিছুই দাঁড়ায় নাই। ইদানীং কুমারী জননীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণীর পরিণত বয়স্ক পুরুষ ও নারীদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ কুমারী বালিকাদিগের জনকজননীর মধ্যে, এইরূপ শঙ্কাজনক অবস্থা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

নাজি সরকারের প্রজনন ব্যবস্থার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র কৃষিক্ষেত্র সমূহ। প্রত্যেক তরুণ তরুণীকে একবৎসর কাল ধরিয়া বাধ্যতা মূলক কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। এখানকার এবং শ্রমিক কেন্দ্রের প্রশংসালিপি ব্যতীত কেহ অন্যত্র চাকরী পায় না। জার্ম্মাণীর তরুণ

তরুণীরা যাহাতে ভ্রাতৃত্ব ও ভগিনীত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে, সেই জন্যই এ সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। তরুণ তরুণীরা ভ্রাতৃত্ব ও ভগিনীত্ব সম্বন্ধে যে ভাবে ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিতেছে, তাহার পরিচয় জার্ম্মাণ প্রসূতি ভবন সমূহে জাজ্জ্বল্যমান। এই সকল প্রতিষ্ঠানে সকল বিষয়ের ব্যবহারিক শিক্ষা তরুণ তরুণীরা লাভ করিয়া থাকে।

নারী শ্রমিক শিবিরের এক পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারীর একখানি চিঠি এখানে উদ্ধৃত হইল। বালিকা তাহার জননীকে লিখিয়াছে, "মা, শীঘ্রই আমার সন্তান হইবে। এখানকার আরও তিনটি মেয়ের এইরূপ অবস্থা।" একখানি খোলা পোষ্ট কার্ডে এই আসন্নপ্রসবা কন্যা পত্র লিখিয়াছে। উহা জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে একটা আশঙ্কার শিহরণ জাগিয়াছে। পরিণতবয়স্ক জার্ম্মাণ নরনারীরা নাজিসরকারের এই জাতিগঠন পদ্ধতির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না বলিয়া মৃদুগুঞ্জন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কিন্তু কুমারী বালিকারা পিতামাতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা বলিতেছে, "তোমরা কি জাননা, হিটলার বলিয়াছেন, জার্ম্মাণীর সন্তান চাই!"

সন্তানপ্রজনন ব্যাপারে নাজি জার্ম্মাণীর এই রূপ দেখা দিলেও জার্ম্মাণীতে বিবাহ পদ্ধতি পূর্ব্বের মতই সাধারণতঃ অব্যাহত আছে। তাহার বিবাহ পদ্ধতি প্রত্যেক খৃষ্টান দেশে যে প্রকার জার্ম্মাণীতেও তাহাই। জার্ম্মাণীতেও পূর্ব্বরাগ ও পরে বিবাহ। গির্জ্জায় রেজেষ্ট্রি করিয়া বিবাহ করিতে হয়।

বিবাহবিচ্ছেদ আইন আছে। কিন্তু হায় হিটলার শাসিত জার্ম্মাণীতে

বিবাহ বিচ্ছেদ সাধারণতঃ দোষাবহ। হার হিটলার গার্হস্থ্য ধর্ম্মকেই অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করেন। খাট স্কার্ট পরারও তিনি বিরোধী সুতরাং নবীন জার্ম্মাণীর নারী সম্প্রদায় ক্রমেই আবার বড়ঝুল স্কার্ট পরিধান করিবার পথে চলিয়াছে।

অষ্ট্রায়া-নারী

অষ্ট্রীয়ায় জার্ম্মাণ ভাব ধারানুসারিণী নারীরা জার্ম্মাণ রীতি বজায় রাখিয়া চলে। তাহাদিগকে অষ্ট্রীয়ান নারী বলা চলে না। শ্লাভজাতীয়া, মাগিয়াবুর্গ বা হাঙ্গেরীর নারী এবং রুমাণীয়া বা ওয়ালচিয়ান নারীরাই প্রকৃত প্রস্তাবে অষ্ট্রীয়নারী বলিয়া পরিচিত।

এই শ্লাভনিক জাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তবে সকলের রীতি প্রায় একই ধরণের। নারীদিগের মধ্যে একটা জনপ্রিয় সঙ্গীত আছে। তাহার অর্থ—"যতদিন বিবাহ না হয়, স্বামিলাভ না ঘটে, ততদিন নৃত্য গীত করিয়া লইব। কিন্তু স্বামী আসিলে নৃত্য গীত বিস্মৃত হইতে হইবে—তখন স্বামীর সার্ট ও পাজামা সেলাই লইয়াই থাকিতে হইবে।" প্রকৃত প্রস্তাবে শ্লাভদেশে ইহা অমোঘ সত্য। স্বামীর অনুগত হইয়া চলা সে দেশের রীতি এবং ভাগ্য।

অতি সুন্দরী সুগঠিত দেহা—"সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" যে নারী, বিবাহের পর তাহারও রূপান্তর ঘটে। অল্পদিনেই সে বৃদ্ধা হইয়া পড়ে। নারীকেই গুরুভার বহন করিতে হয়। কঠোর পরিশ্রম তাহার অদৃষ্টলিপি। নারী স্বামীকে প্রভুর আসনে বসাইয়া তাহার আদেশ পালনে তৎপর হইয়া থাকে। স্বামী ক্রোধবশে প্রহার করিলে, নীরবে পত্নী তাহা পরিপাক করিয়া থাকে। এখানে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত হইল। "She becomes the mere slave and drudge of her

husband aud treats him as her lord and master, receiving blows and rough words silently, eating out of his plate standing behind him, waiting on him and only drinking when he offers her something from his glass," --Women of all Nations. P. 292.

শ্লাভ তরুণীর নীতি জ্ঞান প্রবল। সুচরিত্রের উপর তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। যে তরুণীর সুনাম ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। তাহার নাম "Kuca"। নারী সমাজ তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে অপমান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহ কালে যদি প্রকাশ পায়, তরুণীর চরিত্রে দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল, অমনই বিবাহ বাসরে সমাগত অতিথিগণ দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পড়েন এবং কন্যার পিতাকে তখনই সে কন্যাকে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করা হয়। অথবা বরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

হাঙ্গেরীয় নারী স্বামীর সহচরী, ক্রীতদাসী নহে। বিবাহিত জীবনে হাঙ্গেরীর নারী তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রফুল্লতা বজায় রাখিয়া চলিয়া থাকে। হাঙ্গেরীর নারীরা সাধারণতঃ সুন্দরী, তন্বী। তাহাদের দেহে স্বাস্থ্যের বিমল বিভা বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের জন্য হাঙ্গেরীয় নারীর প্রসিদ্ধি আছে। হাঙ্গেরীয় কৃষক নারী যদি তিনটি পেটিকোট পরিধান না করে, তাহা হইলে সে যেন আপনাকে অর্দ্ধ নগ্না বলিয়া ক্ষুব্ধা হয়।

অভিজাত সম্প্রদায়ের হাঙ্গেরীর নারীরা সদা প্রফুল্ল, বুদ্ধিমতী এবং তরলহৃদয়া। নৃত্যগীতে তাঁহাদের প্রচণ্ড অনুরাগ। আরামে জীবন যাপন তাঁহাদের লক্ষ্য। কিন্তু জননী হিসাবে তাঁহাদের সুখ্যাতি আছে। দীর্ঘকাল হইতে চরিত্রগত অভ্যাসে তাঁহারা হাসি মুখে দুঃখ-

কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। আত্মোৎসর্গের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা উন্মুখ।

শ্লাভ নারীরা ধর্ম্মপরায়ণা। মাতৃত্বে তাঁহাদের প্রবল অনুরাগ। বিবাহ ব্যাপারে স্বয়ংবর প্রথা সাধারণ নহে। পিতামাতাই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। বিবাহ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও কোনও নারী বা পুরুষ উহার ব্যবহার করেন না। খৃষ্টান ধর্ম্মানুসারে জীবন যাত্রা যাপনই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য।

পোর্ত্তুগাল নারী

স্পেন রাজ্যের পার্শ্বেই পোর্ত্তুগাল। স্পেনের মধ্য দিয়া পোর্ত্তুগালে যাইতে হয়। উভয় দেশের ভাষা, আচার ব্যবহার ও রীতিতে সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসার অন্ত নাই। স্পেনের গৃহ-বিবাদে পোর্ত্তুগাল বিপ্লবী ফ্রাঙ্কো দলের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস।

স্পেনের ন্যায় পোর্ত্তুগালের অভিজাত সমাজে মেয়েদের লেখা পড়া শেখার বহু অসুবিধা বর্ত্তমান যুগেও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এখনও নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে পোর্ত্তুগাল প্রগতিবাদের পর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারে নাই।

পোর্ত্তুগালের গরীব গৃহস্থ বা কৃষক ললনাগণের অবস্থা স্পেন বা অন্য দেশের অনুরূপ অবস্থার নারীদিগের তুলনায় অনেক ভাল।

পোর্ত্তুগালের মধ্যবর্ত্তী ও দক্ষিণাঞ্চলে মিশ্র জাতি বাস করে। ইহাদের দেহে সেমিটিক ও নিগ্রো জাতির রক্ত প্রবাহিত। ষোড়শ শতাব্দীতে লিসবন সহরে বহু নিগ্রো আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। তখন শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোজাতির সংখ্যা প্রায় সমানই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিগ্রোজাতির সংখ্যা সমগ পোর্ত্তুগালবাসীর একপঞ্চমাংশ হয়। এই অঞ্চলের পোর্ত্তুগীজ নরনারীর আকৃতি প্রকৃতিতে নিগ্রোজাতির বহু নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে। পোর্ত্তগালের উত্তরাঞ্চলের

অধিবাসীরা রক্তের দিকদিয়া অনেকটা খাঁটি। মিশ্রণ দোষ এই অঞ্চলে প্রবল হইতে পারে নাই।

পোর্ত্তুগালের নারীজাতিকে রূপসী বলা চলে না, তবে তাহাদের দেহ বেশ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট। দেহের বাঁধন খুবই প্রশংসাজনক। তাহাদের মাথার কেশও চোখের তারা কাল।

গরীব গৃহস্থ ও কৃষকঘরের ললনারা মাঠে কান্তারে রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া কাজ করে, এজন্য তাহাদের গাত্রবর্ণ তাম্রাভ। ধনীর দুলালীদিগকে সেরূপ পরিশ্রম করিতে হয় না। তাঁহারা আনন্দ বিলাসে অলসতায় দিন যাপন করেন। সেজন্য তাঁহাদের দেহ তেমন বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট নহে—দেহের বাঁধনও তেমন দৃঢ় নহে। এজন্য ধনীর গৃহলক্ষ্মী বা কন্যাদিগের দেহে তেমন শ্রী দেখিতে পাওয়া যাইবে না। পোর্ত্তুগালের গরীব গৃহস্থঘরের ললনাগণের মধ্যে দুই চারিটি সুন্দরীর দেখা মিলে।

ওভার অঞ্চলে পোর্ত্তুগীজ মৎস্যজীবীদিগের বাস। এই অঞ্চলের নারীরা প্রত্যহ সহরে মৎস্য বিক্রয় করিতে গমন করে। তাহারা চমৎকার সুন্দরী। তাহাদের অধিকাংশেরই মাথায় চামরের ন্যায় দীর্ঘ কাল কেশরাজি, তাহাদের নয়ন যেমন আয়ত তেমনই নয়নাভিরাম। কর্ম্মপটু দেহে বসন্তশ্রী তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। লাবণ্যের বন্যা যেন তাহাদের দেহে ওতপ্রোত হইতেছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, এই ধীবর ললনারা ফিনিসীয় বংশোদ্ভূতা।

ওপর্টোর সন্নিহিত অবিস্তেশ প্রদেশ। এই অঞ্চলের নারীরা সাধারণতঃ সুন্দরী। তাহাদের দেহলতা পল্লবের মত রমণীয়। মেদভার বর্জ্জিত ঋজুদেহ সুঠাম ও সুন্দর। গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ। সমগ্র-দেহ স্বাস্থ্যের বিমল আভায় সমুজ্জ্বল। তাহাদের নয়ন যেন মুখর, বুদ্ধির কিরণ লেখায় তাহা ভাষাময়। এই অঞ্চলে কৃষাণদিগের বাস সমধিক।

দক্ষিণ পোর্ত্তুগাল অঞ্চলের নারীদিগের অধিকাংশই নিগ্রোদিগের মত। গাত্রবর্ণ মলিন। ওষ্ঠ সরু। অনেক নারীর ওষ্ঠের উপরিভাগে গোঁফের রেখা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। সে মূর্ত্তি মনে আনন্দ সঞ্চার করে না। কুরূপা বলিলেই চলে।

পোর্ত্তুগালের অভিজাতগৃহের ললনাদের পোষাকে মাধুর্য্য বা বৈচিত্র্য দেখা যায় না। প্যারীর সৌখীন বিলাসিনীদিগের ফ্যাশনের অনুকরণ পোর্ত্তুগালের অভিজাত ঘরণীদিগের পোষাক পরিচ্ছদে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরিচ্ছদের জন্য তাঁহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের নামে অখ্যাতি আছে।

পোর্ত্তুগালের বিভিন্নস্থানের কৃষাণললনাদিগের মধ্যে বেশভূষার পার্থক্য বিদ্যমান। প্রায়ই কোনও কৃষাণ বধূ বা কন্যা জুতা ব্যবহার করে না। ঘাঘরার ঝুল হাঁটু পর্য্যন্ত। পথ চলিতে অস্বস্তি ও অসুবিধা হয় বলিয়া ছোট ঘাঘরা পরার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের স্কন্ধের উপর বর্ণবৈচিত্র্য বহুল বড় রুমাল উত্তরীয়ের মত ঝুলিতে থাকে। মাথায় কাল টুপী। তাহার চারিদিক বেষ্টিত করিয়া বড় রুমাল বাঁধা থাকে। ইহাকে অবগুণ্ঠন বলা চলে, কিন্তু তাহাতে মুখমণ্ডল আবৃত হয় না—উন্মুক্তই থাকে। ইহাদের সকলেরই গলায় সোনার হার ও "পেণ্ডাণ্ট।"

দরিদ্র গৃহস্থ বা কৃষকদিগের মধ্যে কাজ সম্বন্ধে মেয়ে পুরুষ কোনও পার্থক্য নাই। সকল কর্ম্মেই পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার। নারীরা কুলির কাজ করে, মোট বহে। ষ্টেসনে, জাহাজে মাল উঠান নামান কার্য্যে সমান ভাবে নারী ও পুরুষ কাজ করিতেছে, এ দৃশ্য প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যাইবে। হাটে বাজারে নারীরা বিক্রয় পণ্য লইয়া যায়, ক্রীত পণ্যও তাহারা বহন করিয়া গৃহে লইয়া যায়। ক্ষেত্রে

নারী কর্ম্মীর অভাব নাই। রেল ষ্টেসন, কল কারখানা, সর্ব্বত্রই নারী কাজ করিয়া থাকে। পথের নির্ম্মাণ কার্য্যেও নারী অপাংক্তেয় নহে। পোর্ত্তুগালের দরিদ্র গৃহস্থ কন্যা বধূ বা কৃষক ললনারা মুহূর্ত্ত মাত্র সময় আলস্যে যাপন করে না। বিশ্রাম সময়েও খড়ের বিবিধ প্রকার তৈজস পত্র তৈয়ার করিয়া থাকে।

পোর্ত্তুগাল নারীরা খুব হিসাবী। মিতব্যয়িতা তাহাদের প্রকৃতিগত শিক্ষা। এজন্য পোর্ত্তুগালে কখনও দারিদ্র্য বা অভাবের সঙ্কীর্ণতার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। নারীরা অত্যধিক পরিশ্রম করে। সপ্তাহে মাত্র একদিন তাহাদের বিশ্রাম। রবিবার এবং উৎসব উপলক্ষে তাহাদের জীবনে বিশ্রামের অবকাশ মিলিয়া থাকে। ছুটির দিন মুক্ত বাতাসে, বাধাবন্ধনহীন প্রান্তরে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে।

পোর্ত্তুগালের নারীদিগের চিত্ত সাধারণতঃ সংসারের মায়ায় পূর্ণ থাকে। তাহাদের স্বচ্ছ সরল মনে অন্ধকারের ছায়াপাত কদাচিৎ হইয়া থাকে। নারীরা পুরুষের কাছে কখনও অসম্ভব আব্দার জানায় না। বর্ত্তমান যুগেও তাহারা আকাশের চাঁদ চাহিবার মত মনোবৃত্তি প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হয় নাই।

অসওয়েল ক্রফোর্ড নামক একজন ইংরেজ লেখক পোর্ত্তুগাল সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতামত পণ্ডিত সমাজে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

The Portuguese women are full of quick answers and mother wit, genial and sympathetic.

বাস্তবিক গৃহস্থ বা কৃষাণ ললনারা গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং কাজ-লইয়া সমস্ত সময় ব্যস্ত থাকিলেও, দুঃখ কষ্টে মায়াময়ী সান্ত্বনাদায়িনী গৃহলক্ষ্মী। তাহাদের প্রাণ স্নেহ ও মমতায় পরিপূর্ণ। আলাপে

প্রিয়ভাষিণী, কৌতুক হাস্যের নির্ঝর। সময়ের মূল্য তাহারা ভাল করিয়া বুঝে—জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অভাব দেখা যায় না। সাম্য স্বাধীনতার চীৎকার ধ্বনি তাহাদের কণ্ঠে এখনও ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। জীবনের দুঃখ কষ্ট আনন্দকে সমভাবে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে তাহারা অভ্যস্ত।

নারী পুরুষের কাম্য রত্ন হইলেও প্রণয় ব্যাপারে এখনও পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগাল নারীরা এতটুকু শিথিলপ্রযত্ন, এ অভিযোগ কেহ করিবে না। বহু ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, পোর্ত্তুগাল নারীরা আদর্শ পালনে নিশ্চিন্ত মনে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত। নামে পুরুষের অধীন হইলেও, সাংসারিক সকল ব্যাপারেই পোর্ত্তুগাল নারীর ইচ্ছাই প্রধান।

বিবাহ ব্যাপারে স্পেনের ও পোর্ত্তুগালের আদর্শ সমান। এ যুগের কোন কোন প্রগতিবাদী পোর্ত্তুগীজ অধুনা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, পোর্ত্তুগালে যে সনাতনপ্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা চূর্ণ করিয়া নবযুগের আদর্শে নারীজাতিকে জাগাইয়া তুলা দরকার। নারীদিগকে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত করিয়া না তুলিলে চলিতেছে না। বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকপাতে পোর্ত্তুগীজ নারীর মনকে আলোকিত করিবার সময় আসিয়াছে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলেন যে, পোর্ত্তুগালের নারীরা এ চীৎকারে কর্ণপাত করিতেছে না। তাহারা বলিতেছে, সময়ের প্রভাবে যদি এমন অবস্থা ঘটে, তাহাতে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু সেজন্য সমারোহ সহকারে নবীন সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে এমন কোনও প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

পোর্ত্তুগাল নারীরা পুরাতন রীতি এবং আদর্শের অনুরাগিণী

যাহারা প্রগতিবাদের পক্ষপাতী, পোর্ত্তুগীজ নারীরা তাহাদিগকে বলিতেছে যে নারীর স্বাধীনতার জন্য তোমরা চীৎকার করিয়া মরিতেছ কেন? আমাদের পিতামহী মাতামহী জননী প্রভৃতি যে জীবনে পরম সুখ অনুভব করিয়াছেন, যে জীবন যাত্রার সহিত আমরা সুপরিচিত আমরা সে জীবন যাত্রায় সুখে দিন কাটাইতেছি। যে জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, সেই জীবনের সুখ কামনা করিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান সুখ ও শান্তিপূর্ণ জীবনে বিরোধের সূত্রপাত ঘটিতে দিতে চাহি না।

এইভাবে বর্ত্তমান পোর্ত্তুগীজ নারী অভ্যস্ত পথে চলিয়াছে।

ফরাসী নার্

ফরাসী দেশে দুইটি জাতি—উত্তর ফরাসী ও দক্ষিণ ফরাসী। এই দুই অঞ্চলে বৃটানী ও প্রভেন্সের নারী সমাজে আকার ও আচারগত পার্থক্য আছে। বৃটানীর ফরাসী জাতির স্ত্রী পুরুষের গঠন দীর্ঘ, চক্ষুতারকা নীল অথবা ধূসর। মাথা ডিম্বাকৃতি, মাথার কেশ অপেক্ষাকৃত পাতলা এ জাতির নারীরা বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রগতি যুগেও প্রাচীন বেশ ভূষা ও আচার রীতি রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

প্রভেন্সের দক্ষিণে লয়ার অঞ্চলে যে সব ফরাসীর বাস, তাহাদের সঙ্গে বৃটানির ফরাসী জাতির আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রভেন্সের নারী জাতি খর্ব্বকায়া। তাহাদের গঠনসৌষ্ঠব সুন্দর। গাত্র বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।

ফরাসী নারীর সহজ আলাপ ভঙ্গী এবং প্রখর বুদ্ধি দর্শকের মনকে প্রভাবিত করে। ফরাসী নারীরা প্রগলভা—তাহাদের উক্তি প্রত্যুক্তিতে চটুলতা ও পটুতা প্রচুর। কিন্তু ফরাসী নারীর গৃহানুরাগ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সমগ্র ইউরোপে ফরাসী নারীর মত গৃহানুরাগিণী গৃহিণী দেখা যায় না। কর্ম্মক্ষেত্রে ফরাসী নারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার ক্ষেত্রেও গৃহিণীপনার নিপুণতা বিস্ময়কর।

আর্লে প্রদেশের নারীরা খুব সুন্দরী। প্রভেন্সের নারী খোস খেয়ালী এবং প্যারীর নারীরা বিলাসিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। নর্ম্মাণ্ডি বৃটানিরও

সুন্দরীরা সংসারপরিচালনায় বুদ্ধিমত্তা ও সংযমের পরিচয় দিয়া থাকেন। অর্থের অপব্যয় যাহাতে না হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি তাঁহাদের থাকে। ধনী পরিবারে ইদানীং অলস নারী থাকিলেও, গৃহস্থ ঘরে—মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র পরিবারের কোনও নারীকে এখনও কর্ম্মবিমুখ দেখা যাইবে না। বিলাস লীলায়, ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহাদের প্রচুর অনুরাগ সত্ত্বেও গৃহকর্ম্মে তাঁহারা বিন্দুমাত্র উদাসীন নহেন। হাস্যমুখেই তাঁহারা যাবতীয় কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ফরাসীজাতির মধ্যে দারিদ্র্যতেমন প্রবল নহে।

বর্ত্তমান ধনী সমাজ ব্যবসায়ী, বণিক এবং রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতিকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা বড় বড় নগরে বাস করে। তাঁহারাই জাতির মেরুদণ্ড। পল্লী অঞ্চলে কৃষিজীবীরা বাস করিয়া থাকে। পল্লীজীবনে অভ্যস্ত কৃষক নরনারী এখনও প্রাচীন সংস্কারের অনুরাগী। আমেরিকার নারী সমাজে যে আধুনিক প্রগতিবাদের বাতাস বহিতেছে, সে বাতাস এখনও ফরাসী নারী সমাজে প্রবেশ করে নাই। ফরাসী নারী সমাজ এখনও পুরাতন আচার নীতি মানিয়া চলে। আত্মীয়বন্ধুর অভিমত, প্রতিবেশীর মতামত, সমাজের অভিমত তাঁহারা এখনও উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত হন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জটিলতা তাঁহাদের জীবনে দেখা দেয় নাই।

ফরাসী নারী বিশেষ সুন্দরী বলিয়া বিশ্ববাসী জানে। তবে প্যারী নগরীর নারীদিগকে মোহিনী বিলাসিনী বলিয়াই সকলে অভিহিত করিয়া থাকে। প্যারীর রমণীকুলের শিক্ষা ও সভ্যতা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহারা ফ্যাসান সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের রূপের সম্মোহন শক্তির প্রভাব অসামান্য। কিন্তু পল্লীর ফরাসী নারীরা সরলতার জন্য সমাদৃতা। তাঁহারা অত্যন্ত অতিথি-বৎসল বলিয়া পরিচিতা। আর্ট বা ললিতকলা ফ্রান্সের একটা বৈশিষ্ট্য, কিন্তু কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগর ব্যতীত

অন্যত্র ফরাসী নারীরা এই শিল্প বা ললিতকলার তেমন সংবাদ রাখে না। বর্ত্তমান যুগে প্যারীর নারীকুল জীবনকে সফলতায় মণ্ডিত করিবার জন্য জাগিয়া উঠিয়াছেন।

ফরাসী নারীদিগের ধর্ম্মে কর্ম্মে ভগবৎ উপাসনায় বিশ্বাস অটল, অনুরাগও প্রবল। পুরুষজাতি যেমন এ সকল বিষয়ে উদাসীন, নারীরা তেমনই আগ্রহশীলা। ফরাসীদেশের অনেক নগর ও পল্লী অঞ্চলে এখনও প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় আছে। সেই সব অভিজাত সমাজের নারীরা এখনও "সোসাইটীতে" প্রবেশ লাভ করেন নাই—সে সুযোগ তাঁহাদের জীবনে এখনও ঘটে নাই। আধুনিক মতবাদ এই সকল অভিজাত সমাজে এখনও প্রসারলাভ করে নাই। এখনও প্রাচীন গৌরবের স্মৃতির প্রতি তাঁহাবা আসক্ত।

প্যারী সহরে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল, ফ্রান্সের অনেক নগর এবং পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বত্র তাহার চিহ্নমাত্র নাই। প্যারীর নারীরা বেশভূষার আডম্বরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। যে সকল নারী শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অর্থার্জ্জন করে, তাহারাও বেশভূষার ব্যয়ভার বহন করিতে উপার্জ্জনের অর্থ নিঃশেষ করিয়া ফেলে। বিবাহের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত নারীরা নিষেধ শাসন মানিয়া চলে বটে, কিন্তু বিবাহ হইয়া গেলে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাতাস লাগিয়া তাহাদের বন্ধন ঘুচিয়া যায়। স্বামী ও স্বামীর বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নৃত্য গীত, পান ভোজনে তাহারা মার্কিন নারীর মতই সমান ভাবে তাল রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকে। প্যারীর নারীদিগের বেশভূষায় সুরুচির পরিচয় যত না মিলিবে, আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বাহুল্য তত বেশী। প্যারীর সৌখীন সমাজে চরিত্র রক্ষার দিকে লক্ষ্য অধিকাংশেরই নাই। জীবনটা যে শুধু আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে হইবে ইহাই সাধারণ লক্ষ্য।

তথাপি কুমারী তরুণীদিগের সম্বন্ধে সমাজের শাসন খুব কঠোর। কোনও কুমারী হাস্যে লাস্যে প্রমোদ জীবন যাপন করিলে তাহার নিন্দার সীমা থাকে না। এ বিষয়ে সমাজের বিধি নিষেধ খুবই কঠোর। বিবাহের পর প্যারী নারী যাহা খুসী করিতে পারে, সমাজ কথা কহিবে না। কারণ, তখন সমস্ত দায়িত্ব তাহার স্বামীর।

প্যারীর নারী সমাজ নূতনত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। এজন্য পুরাতনে তাহার প্রীতি নাই। বর্ত্তমানযুগে প্যারীর নারীরা ব্যায়ামানু-রাগিণী হইয়া উঠিয়াছে। তবে খেয়ালই তাহার মূল উৎস। দীর্ঘকাল একই বিষয়ে আসক্তি প্যারীর নারী সমাজে দুর্ল্লভ। প্যারীর নারীদিগের অনেকেই বড় বড় দোকান বা কার্য্যালয়ে কাজ করিয়া থাকে।

বহু তরুণী ফুলের ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহাতে বেশ অর্থোপার্জ্জন হইয়া থাকে। ফুল বেচিবার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট রসাল কথা এবং নয়নের দৃষ্টি বিভঙ্গী ক্রেতা লাভ করিয়া থাকে। প্যারী সহরের দাসী যাহারা তাহাদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝা যায় না, তাহারা পরিচারিকার কার্য্য করে। তাহাদের সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রচুর। অর্থ ব্যয় করিয়া তাহারাও ফুল ক্রয় করিয়া দেহ ও গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকে।

প্যারীর প্রমোদ উদ্যানসমূহে প্রত্যহ নারীর মেলা বসে। পরিচারিকা শিক্ষয়িত্রী, মঠবাসিনী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রী—সকলেই প্রত্যহ সমবেত হয়। সকলেরই বেশভূষার আড়ম্বর চমকপ্রদ।

কিন্তু পল্লীর দৃশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কৃষক ললনাদিগের আননে নয়নে সম্ভ্রমের ভাব ফুটিয়া উঠে। চরিত্রের মর্য্যাদাবোধ তাহাদের যথেষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লীর ললনাকুল ধর্ম্মপরায়ণা। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহারা প্যারীর বিলাসিনীদিগের অনুসরণ করিতে চাহে না। প্যারীর জীবন-প্রণালী তাহারা ঘৃণা করিয়া থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

থাকিলেও বিলাসব্যসনে তাহারা অর্থের অপব্যয় করে না। বিলাসিতাকে তাহারা অভদ্রতা ও ইতরতা বলিয়া এখনও বিশ্বাস করে। পল্লীর বহু তরুণী প্যারী সহরে জীবিকার্জ্জনে আসিলেও তাহারা সম্ভ্রম বাঁচাইয়া, আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। সহরে থাকিবার সময়, কখনও কখনও বেশভূষায় ফ্যাসানের বাহুল্য থাকিলেও, গ্রামে ফিরিয়া তাহারা সহজ পল্লীজীবনের আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। নহিলে লজ্জা ও কলঙ্ক বংশগৌরবকে ম্লান করিয়া দিবে।

কায়িক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকার্জ্জনের দিকে এযুগের ফরাসিনীদিগের মন ধাবিত হইলেও, বিবাহই তাহাদের জীবনের প্রধান কাম্য। পল্লীর নারীরা দাস্য বৃত্তির অনুরাগিণী নহে, উহাতে তাহাদের প্রবল বিরাগ। পল্লীর ফরাসিনীরা কৃপণ বলিয়া খ্যাত। কথাটা খুবই সত্য। কারণ, বাজে অর্থ ব্যয় করিতে তাহারা আদৌ সম্মত নহে। সঞ্চয়ের দিকে ফ্রান্সের পল্লীনারীর বিশেষ লক্ষ্য। স্বহস্তে তাহারা গৃহের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যই প্রস্তুত করিয়া থাকে। পরিধেয় পোষাক পর্য্যন্ত দরজীর দ্বারা প্রস্তুত করাইতে সাধারণতঃ কেহ রাজি নহে। পরিশ্রমে তাহারা বিন্দু মাত্র কাতর নহে।

ফরাসী গ্রাম্য নারীদিগের বাগানের সখ খুব বেশী। প্রত্যেকেরই গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান আছে। তাহারা গন্ধ দ্রব্য গৃহেই প্রস্তুত করিয়া লয়।

ব্যবসায়ে ফরাসী নারীর সাধুতা উল্লেখযোগ্য। পল্লীর নারী-সমাজে সুরার প্রতি আসক্তি নাই বলিলেই চলে। অল্পবয়সে পল্লী নারীর বিবাহ হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ তাহাদের মধ্যে অপরিজ্ঞাত। প্রতিবেশী-দিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিবাহে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে মোটা যৌতুক দিয়া থাকে। যেমন তেমন পাত্রে কোনও ফরাসী পিতা কন্যা দান করিতে চাহে না। ধনিদরিদ্র

সকল সমাজেই এই ব্যবস্থা। কন্যা বিবাহের পর স্বামীর গৃহে যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এমন ঘর বর দেখিয়া পিতা কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য সুপাত্রের দাম ফরাসীদেশে অত্যন্ত অধিক।

বৃটানি অঞ্চলে মৌবন নামক একটি স্থান আছে। প্রতিবৎসর জুন মাসের ৭ই তারিখে বিবাহযোগ্যা মেয়েরা তথায় বিবাহের বাজার বসায়। অবিবাহিত তরুণের দল সেখানে সাজসজ্জা করিয়া আসে। মেয়েরা পছন্দমত এক একজন তরুণকে নিমন্ত্রণ করে। তাহারা তাহাদিগকে আহার্য্য দ্বারা পরিতুষ্ট করে। আহারান্তে যুগলে যুগলে বন ভ্রমণে গমন করে। সেখানে বিবাহের প্রস্তাব হয়। রাত্রিকালে নৃত্য গীত হয়। পরদিবস প্রভাতে বিবাহের পাকা কথা সকলে জানিতে পারে। বহুকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এখনও অবাধে চলিয়াছে।

ফরাসী জাতি গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষপাতী। ফরাসী নারী কায়মনোবাক্যে সংসার প্রতিপালন করিতে থাকে। এজন্য দেবী ইন্দিরা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন। অতিথিবৎসল হইলেও, ফরাসীরা কোনও অতিথিকে অন্দরে লইয়া যাইবে না। বিদেশী অন্দরে স্থান পাইতে পারে না। ফরাসী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান প্রগতি যুগেও সমান ভাবে বিদ্যমান।

স্পেনের নারী

স্পেন যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোরম, সেই দেশের নারীও তেমনই লোক মনোমোহিনী। স্পেনের নারীর কোমল মেয়েলিভাব তাহার বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। ইউরোপের চারিদিকে নারী প্রগতি প্রবলভাবে চলিলেও বর্ত্তমানযুগে স্পেনীয় নারী এখনও পুরুষের মত হইয়া উঠে নাই। অর্থাৎ নারীর স্বভাবকোমল মাধুর্য্য এখনও স্পেনের নারী সমাজের বৈশিষ্ট্য। বীরত্বের তাহারা ভক্ত, নিজেরাও প্রয়োজন হইলে অস্ত্রধারণ করিতে পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু পুরুষালিভাব তাহারা ভালবাসে না। দেহের গঠনে, ভঙ্গিমায় ললিত মাধুর্য্য লীলায়িত হইয়া উঠে।

স্পেন নারীর দৈহিক স্বাস্থ্য সুন্দর, পরিপূর্ণ এবং অটুট। আকার মধ্যম, দেহ নিটোল। মস্তকের কেশরাজি ঘনকৃষ্ণ, নয়নযুগল সুন্দর। স্পেনে নারী প্রকৃতই সুন্দরী মনোমোহিনী। সাধারণতঃ স্পেন-নারীর বর্ণ-সুষমা চমৎকার, বেশেও বৈচিত্র্য আছে। ইদানীং স্পেন সীমন্তিনীরা ফরাসীর আদর্শে বেশভূষা করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু পল্লী গৃহস্থ ও কৃষক ললনারা পুরাতন বেশভূষার অনুরাগিণী। সে বেশের প্রতি তাহাদের মর্য্যাদাবোধ আছে। দরিদ্র স্পেন নারীরও মাথায় ফুলের সজ্জা দেখিতে পাওয়া যাইবে। অবশ্য অভিজাত ও ধনিগৃহের ললনারা এখন হ্যাট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্পেননারী কখনও ফ্যাসানের মোহে মুগ্ধ হইয়া আত্মসম্বিত হারায় নাই। কাল ঘাঘরা ও জামা, মাথায় কাল অবগুণ্ঠনই ছিল স্পেনের নারীর সাধারণ বেশ। ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং উৎসব প্রভৃতিতে এই বেশের প্রাচুর্য্য এখনও দৃষ্টিগোচর হইবে। কোনও ধর্ম্মকার্য্যে ফ্যাসান যুক্ত পোষাক পরিধান করিয়া যোগদান অসঙ্গত, ইহা স্পেননারীর আজন্ম বর্দ্ধিত সংস্কার। ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দিবার সময় কোনও আধুনিকা স্পেন মহিলা সেরূপ বেশ পরিধান করিবেন না।

স্পেন নারীর বিবাহ পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণের সার্টিনে নিম্মিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের লেস রচিত অবগুণ্ঠন মুখমণ্ডল আবৃত করে। এ যুগেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ধনিগৃহে ইদানীং কালরঙ্গের রেশমের অবগুণ্ঠন মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে কাল রঙ্গের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে কোথাও বিচিত্র বিবিধবর্ণের পরিচ্ছদের প্রবর্ত্তন ঘটে নাই। ক্রীড়া প্রাঙ্গনে পুরাতন জাতীয় পোষাক পরিয়া স্পেন-সীমন্তিনীরা উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহাদের মস্তকে ফুল ও চিরুণীর বাহার, তাহার উপর সাদা লেসের অবগুণ্ঠন, বক্ষোদেশে পুষ্প স্তবক।

স্পেনের মেয়েদের বয়সের অনুপাতে দেহের পরিপুষ্টি শীঘ্র ঘটে। যে বয়সে ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির মেয়েরা লাফালাফি করিয়া, টেনিস খেলিয়া বেড়ায়, যেরূপ বয়সের স্পেনীয় মেয়ে ব্রীড়াবনতা, লাজনম্রা। বালিকাবয়সে স্পেন-কন্যারা চঞ্চলা, ক্রীড়াময়ী—সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু কিশোর বয়স প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের বিবাহ হয়। তখন আর তাহারা বেপরোয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায় না।

স্পেনদেশে পুরুষ ও নারীর অবাধ সম্মেলন নাই বলিলেই চলে। তাহারা মনে করে, ঘৃতের সহিত অগ্নির যে সম্বন্ধ, নারীর সহিত পুরুষেরও

ঠিক সেই সম্বন্ধ। এজন্য অবাধ মেলা মেশার ব্যবস্থা স্পেনে নাই।

বিবাহ ব্যাপারে বাক্‌দান প্রথা প্রচলিত আছে। বাক্‌দানের পর কন্যা, পাত্রের সঙ্গে একত্র হাসিগল্প করিয়া থাকে, নৃত্য গীতও নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু সে সকল ব্যাপার অভিভাবকদিগের অগোচরে নহে, তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে এ সকল ব্যাপার চলিবে না। স্পেনের সমাজ এখনও সে সম্বন্ধে দৃঢ়।

স্পেনের আধুনিকা নারীও এইরূপ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। তাহারা মনে করে, ইহাতে অশোভন দাস্যতা কিছু নাই। বিবাহবন্ধন স্পেনে দাসত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় না। স্পেনীয় নারী সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকে যে, বিবাহেই নারী জন্ম সার্থক হয়। তাই বিবাহের পর স্বামীর সংসারে সে প্রফুল্লচিত্তে গমন করে। পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের গৌরবে সে নিজের জীবনকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করে। আমাদের হিন্দুনারীর ন্যায় স্পেনীয় নারী পত্নীত্ব ও মাতৃত্বকেই জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

স্পেনের নারীরা সাধারণতঃ বুদ্ধিমতী। ধর্ম্মে প্রচণ্ড নিষ্ঠাবশতঃ স্পেনের নারী দুর্নীতির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। দাম্পত্যজীবনে কলহ বিরোধ সর্ব্বত্রই আছে। সুতরাং স্পেনের দাম্পত্য জীবনেও তাহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রবল ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অটল বিশ্বাসের প্রভাবে রমণীরা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ব্যাকুল নহে।

স্পেনের বিবাহ ব্যাপারে পূর্ব্বরাগ ও প্রণয়ের সংস্রব আছে। ধন-সম্পদের মোহ বা অন্য প্রকার হীন স্বার্থ সংস্রব সাধারণ নরনারীর বিবাহে থাকে না। স্পেনের আদর্শ—ভালবাসাই সব। বিবাহ ভালবাসার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ধনসম্পদের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু সেখানে

ধন সম্পদ নিরর্থক। কর্ম্মফল বা ভাগ্যবশে ধনসম্পদ যদি মিলে, ভালই।

স্পেনে সাধারণতঃ পুরুষই সংসারে প্রধান ব্যক্তি। নারী পুরুষের প্রণয়িনী, সেবিকা। এই আদর্শ দীর্ঘকাল ধরিয়া স্পেনে চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি সুবিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিকা ডোনা বাজান তাহার রচনায় নারীর মুক্তির বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার রচনায় দেখা যায়, সনাতন দাসীত্ব অর্থাৎ নারী পুরুষের আদেশ নির্ব্বিকার চিত্তে মানিয়া চলিবে, এরূপ ব্যবস্থা এ যুগে চলিতে পারে না। বিবাহ-বন্ধন ব্যতীত নারীজাতির অন্য গতি নাই, ইহা অতি সাংঘাতিক কথা। স্পেনের নারীসমাজ দাস্যের বন্ধনে মৃতকল্প। তাই তিনি শুনাইতেছেন—উঠ, জাগ, নারীর মনকে বাঁচাও—আলো ও বাতাসের মুক্ত স্নিগ্ধ ধারায় নারীব চিত্তকে জীবনের স্পর্শ অনুভব করিতে দাও।

তাঁহার বাণী শিক্ষিতা নারী সমাজে আদৃত হইয়াছে। কিন্তু স্পেননারী আদর্শভ্রষ্টা হয় নাই। নারীসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে সত্য। কিন্তু সে জাগরণ উগ্রতা-পূর্ণ নহে। আতিশয্য তাহারা ভালবাসে না; অসমাঞ্জস্য তাহাদের ধাতুসহ নহে। চরণতলে আধুনিকা স্পেননারী পিষ্ট হইতে চাহে না। অথচ মাথায় উঠিয়া বসিবে, তাহাও কাম্য নহে। সখী, সঙ্গিনীরূপে বর্ত্তমানের স্পেননারী পুরুষের সাহায্য করিবার বাসনা রাখে। জীবনের পথে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিবে, ইহাই বর্ত্তমান স্পেন নারীর কাম্য।

স্পেনের আবহাওয়া ইউরোপীয় ধরণের নহে। স্পেনে পদমর্য্যাদার মূল্য আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতা কেহ মানিতে চাহে না। জমিদারকেও মাথায় টুপি খুলিয়া পরিচারিকাকে অভিবাদন জানাইতে হয়। নারীর প্রতি পুরুষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে, ইহা সেখানকার নিয়ম।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা অর্থোপার্জন করিবে, ইহা স্পেন চিন্তা করিতেও শিহরিয়া উঠে। সামাজিক মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অভাবের জন্য নারী অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইবে, ইহা অসহ্য। এই সংস্কার এখনও স্পেনের সমাজকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নারী অর্থোপার্জ্জন করিবে ইহা স্পেন সমাজ বরদাস্ত করিতে পারে না।

পথে প্রান্তরে, নারীর দর্শন পাইলেই, পুরুষ তাহাকে সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া থাকে। অপরিচিতা নারী দেখিলেও স্পেনীয় পুরুষ টুপী খুলিয়া নমস্কার জ্ঞাপন করে। নারী স্পেন সমাজে নমস্যা বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা। অপরিচিত কোনও পুরুষ কোনও নারীর অঙ্গে পুষ্প নিক্ষেপ করিলে, তাহা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। এ অধিকার সুন্দরীর সর্ব্বজনস্বীকৃত। পুরুষ নারীর প্রতি ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিতেছে। স্পেন সমাজে পুষ্প নিক্ষেপ প্রথা আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোনও অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীকে পথে দেখিয়া যদি দর্শক যুবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রেমের গান গাহিয়া উঠে, তাহাতে স্পেন সুন্দরী আপনাকে অপমানিতা জ্ঞান করিবে না বরং না করিলেই অভদ্রতা প্রকাশ পাইতে পারে। নারী বন্দনায় স্পেন দেশ ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান স্পেন যুদ্ধে বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে স্পেনের বহু নারী অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা দেশপ্রেমের মন্ত্রে এমন দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন যে, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া বিদ্রোহী বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। সংগ্রামের ভীষণ কঠোরতা সহ্য করিতেও স্পেনের নারী-সমাজ এ যুগে পশ্চাৎপদ নহেন। নিষ্ঠা ও সংযমপূত জীবন ধারায় অভ্যস্ত বলিয়াই স্পেন নারী আজ অসাধ্য সাধনে তৎপর হইয়াছেন।

ইটালীর সুন্দরী

বর্ত্তমান ইটালী দেশের নারী সম্বন্ধে যেরূপ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় এমন কুত্রাপি নাই। অবশ্য আইনগত পার্থক্য কোথাও নাই। কিন্তু প্রদেশ হিসাবে আচার ব্যবহার, রীতিনীতির পার্থক্য বিদ্যমান। প্রত্যেক প্রদেশের নারীরা প্রাচীন রীতি নীতি সামাজিক ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

দেশের আইন অনুসারে প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর সম্পত্তি তাহার নিজস্ব। স্বামীর তাহাতে কোনও অধিকার নাই। স্বামী ইচ্ছা করিলে পত্নীর কোন সম্পত্তিতে ভাগ বসাইতে পারে না। মাতাই সন্তানগণের অভিভাবিকা। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় কন্যারও সমান অধিকার আছে। শুধু দুই একটি ক্ষেত্রে পুরুষের অপেক্ষা নারীর অধিকার অল্প। বিবাহের সময় যত অল্পই হউক, কন্যাকে যৌতুক দিতেই হইবে। যদি কন্যা সন্তানবতী না হয়, তাহা হইলে যৌতুকের দাম আবার দাতার বংশধরগণের কাছে ফিরিয়া আসে।

ইটালীদেশে আরও অনেক দেশের ন্যায়, নারীর পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারতা নাই। তাই বিবাহই নারীর পক্ষে পরম ও চরম কাম্য। চিরকুমারী থাকা ইটালীতে লজ্জার কথা। স্ত্রী বা পত্নী হিসাবেই নারী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে। কোনও অবিবাহিতা

নারী ৪০ বৎসর বয়স্কা হইলেও একাকিনী রাজপথে বিচরণ করিবার অধিকারিণী নহে। ইহাই দেশের রীতি।

দক্ষিণ ইটালিতে বিশেষতঃ সিসিলিতে বিবাহিতা নারীও পরপুরুষের সহিত অবাধে দেখাসাক্ষাৎ করে না। মিসেস লুসী গার্ণেট লিখিয়াছেন, "In some districts of this island (Sicilly), a man may have lived for twenty years on intimate terms with a neighbour without even having exchanged a word with his wife or daughter. In these localities when a husband goes abroad, he leaves his wife, should she be young, under lock and key."

এরূপ অবস্থায় স্ত্রীও কোনও প্রতিবাদ করে না। বরং ইহা না করিলে স্ত্রী মনে করেন, স্বামী তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই—স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব তাহাতে অনুসূচিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে যে সকল স্থানে বিদেশীরা সর্ব্বদা গতায়াত করিয়া থাকেন, সেখানে এইরূপ ব্যবহারের কিছু শিথিলতা ঘটিতেছে—তরুণীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষার বিস্তারের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। ইটালীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আছে।

পুরুষ ও নারী ভেদে ইটালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তবে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে। কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার জন্যও স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারীদিগের জন্য বিদ্যমান। তবে ছাত্রী সংখ্যা আশানুরূপ অধিক এখনও হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নারীরা সাহিত্য প্রাকৃতবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেই অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইদানীং অনেক মহিলা চিকিৎসক ইটালীতেদেখা যাইবে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও অনেকগুলি নারী অধ্যাপক হইয়াছেন।

ইটালীতে চিত্রবিদ্যায় নারী-শিল্পী এখনও তেমন খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তবে সাহিত্যে গ্রাজিয়া ডেলেডা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত উপন্যাস সমূহে প্রতিভার পরিচয় আছে। ছোট গল্প রচনায় মাটিণ্ডা সেরাও বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারে নারীরা পুরুষদিগের সমান পর্য্যায়ে এখনও দাঁড়াইতে পারেন নাই। এখনও ইটালীতে বহু বর্ণজ্ঞানহীনা নারী বিদ্যমান। মুসোলিনীর আমলেও সে বর্ণজ্ঞানহীনতা তিরোহিত হয় নাই। কারণ, নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও বহুলোকের বিরুদ্ধ ধারণা আছে। পুরুষরা শিক্ষিত হইলেও তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"All Church and Children"—অর্থাৎ নারীরা ধর্ম্মজীবন যাপন করুন এবং সন্তান প্রতিপালন করিতে থাকুন।

গৃহ বলিতে ইটালীতে দেশের গ্রাম বা সহর বুঝায়। কারণ, পুরুষরা সারাদিন কাজে এবং বাজারে যাপন করিয়া থাকে। বেশভূষায় তাহারা উপার্জ্জনের অর্থ ব্যয় করে—আমোদ প্রমোদে টাকা কড়ি খরচ করিতে তাহাদের কুণ্ঠা নাই। ইটালীর বাসভবন বলিতে ফ্লাট বুঝায়। সেখানে আনন্দের সমারোহের একান্ত অভাব।

শীতকালে পশমের বস্ত্রে পুরুষ ও নারী দেহ আবৃত করে। কিন্তু বাসগৃহে তাহারা কার্পেট বিহীন থাকিতে কষ্টবোধ করে না। লোকসমাজে শৌখীন নাম কিনিবার আগ্রহ পুরুষ ও নারীতে সমভাবে বিদ্যমান।

কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, ঘটা করিয়া সে সংবাদ প্রকাশ করা চাই। কিন্তু জন্ম, বাকদান বা বিবাহ ব্যাপারে শুধু অন্তরঙ্গগণ ব্যতীত কাহাকেও জানাইবার রীতি নাই। এখনও এমন দেখা যায় যে, কাহারও মাতা স্ত্রী বা ভগিনীর চিত্র যদি কোনও সাময়িক বা সংবাদ পত্রে বাহির তবে তাহা সম্মানহানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়

ইটালী কৃষিপ্রধান দেশ। ইটালীর নারীর পরিচয় কৃষিপ্রধান অঞ্চলেই সম্যকরূপে পাওয়া যায়। কৃষি ব্যাপারে নারীরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকে। রেশম কীটের উৎপাদন পুষ্টিব্যাপারে নারীই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

পুষ্পপ্রীতি ইটালীর নারীর মজ্জাগত। অনেক নারী ফুলের বেসাতি করিয়া থাকে।

ইটালীর নারীরা ধর্ম্মপ্রাণ। বিবাহ ব্যাপারে সাধারণতঃ পিতামাতা পাত্র মনোনয়ন করিয়া থাকেন। বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহার প্রয়োগ অল্প। ইটালীর নারীর মাতৃত্বই প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

রুমানিয়ার নারী

রুমানিয়ায় প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন দেখিতে পাওয়া যাইবে। রোমক, হুন্, পোল, তুর্ক সকলেরই সভ্যতার ছাপ রুমানিয়া দেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে। উল্লিখিত জাতিসমূহের কৃষ্টি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির ছাপ রুমানিয়ার অধিবাসী নরনারীদিগের মধ্যে বিদ্যমান।

এ দেশের রাজপথে নারীরা সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, এদৃশ্য সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। নানাবিধ সভ্যতার ছাপ সত্ত্বেও অবরোধের বালাই রুমানিয়ায় নাই। তবে নারীদিগের অঙ্গ স্বল্প পরিচ্ছদে আবৃত নহে।

এদেশের জনসাধারণ, পুরুষ ও নারী ধর্ম্মপরায়ণ। দৈনিক জীবন যাত্রার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ যে ধর্ম্ম এ সম্বন্ধে পুরুষ ও নারী সমানভাবে সচেতন। পুরুষদিগের ন্যায় সকল স্তরের নারীই সহজ ও সরল স্বভাবা।

রুমানীয় নারীরা ফুল ভালবাসে। তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইলেও পল্লীগ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ে নিরক্ষরতা এ যুগেও প্রবল। কিন্তু চাষী সম্প্রদায়ের পুরুষদিগের মত নারীরাও অত্যন্ত সদালাপী, শিষ্ট, শান্ত এবং ভদ্র। দেশীয় পরিচ্ছদে নারীরাও দেহ আবৃত রাখিয়া থাকে। দেশাত্মবোধ নারীদিগের মধ্যেও জাগ্রত।

অভিজাতবংশের নারীরা শিক্ষায় অগ্রসর হইলেও, দেশীয় ভাবধারা

তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। ফরাসী বিলাসিনীদিগের সহিত তাঁহাদের প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। ধর্ম্মানুরক্তি বশতঃ পারিবারিক জীবনের শুভ্রতা ও শান্তি রক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বদা যত্নবতী।

রুমানীয় নারীরা সূচিশিল্পে বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহারা সূচের সাহায্যে নানাপ্রকার কারুশিল্প রচনা করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা নারীরাও এ কার্য্যে অল্প নিপুণতা প্রদর্শন করে না।

গ্রামের নারীরা স্বহস্তে গম পেষণ করিয়া থাকেন। গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য তাঁহারা স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া থাকেন। স্বামী ও সন্তানগণের সেবায় উচ্চনীচ সর্ব্বশ্রেণীর রুমানীয় নারীই অনুক্ষণ রত থাকেন।

বিবাহ ব্যাপারে রুমানীয়ার জনসাধারণ সাধারণতঃ খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত প্রাচীন ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া থাকে। মনোনয়ন প্রথার প্রচলন বিশেষ ভাবে নাই। কন্যার অভিভাবকগণই পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। তবে পাত্রপাত্রীর দেখা সাক্ষাৎ পূর্ব্বেই ঘটে না এমন নহে।

পল্লীগ্রামে বিবাহের বাজার বসে। তাহা অতি বিচিত্র। গ্রামের নারীরা বিক্রেয় দ্রব্য লইয়া বাজারে আসে। পুরুষরাও দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশে তথায় গমন করে। বিকিকিনির অবসরে পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন ব্যাপার সংঘটিত হয়। তারপর রীতিমত ধর্ম্মমন্দিরে বিবাহ রেজেষ্ট্রী হইয়া থাকে। নব বিবাহিত দম্পতি রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে আসিয়া বিবাহ ব্যাপার রেজেষ্ট্রী করিয়া লয়।

তারপর আত্মীয় স্বজন এক সভায় সমবেত হইয়া উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদুপলক্ষে নৃত্য গীতাদির ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানযুগে তরুণ তরুণীর মিলিত নৃত্য রুমানীয়ায় দর্শনীয় ব্যাপার। একজন তরুণ তারপর একজন তরুণী। এইভাবে অনেকগুলি একত্র হইয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু নৃত্যের মধ্যে অশোভন অঙ্গভঙ্গীর বালাই নাই।

আইন অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অধিক নহে। কদাচিৎ এ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্ম বিশ্বাস বশে কেহ সহসা বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে চাহে না।

যুবক যুবতীদিগের মধ্যে নির্জ্জনে অবাধ মেলামেশার রীতিাই ন কারণ, ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ ও নারীর কাছে উহা প্রার্থনীয় নহে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ইদানীং দেখা গেলেও, পল্লীগ্রামের সমাজে এরূপ ব্যবস্থা নাই।

রুমানিয়া সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিক্ষেত্রে শস্য বপনের পূর্ব্বে কৃষক নরনারীরা একত্র মিলিত হইয়া শস্য বৃদ্ধির জন্য মুক্ত ক্ষেত্রে উপাসনা করিয়া থাকে। নারীরা পুরুষদিগের সহিত শস্য ক্ষেত্রে শস্য কর্ত্তন কার্য্যে যোগ দেয়।

রুমানিয়ায় বেদিয়া বা যাযাবর সম্প্রদায়ের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদিয়া নারীরা—বালকবালিকাগণ, নাচ গান ও বাদ্য ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ। রাজপথে বেদিয়া বাদকবাদিকাগণকে বেহালা বাজাইয়া প্রায় গান গাহিতে দেখা যাইবে।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও প্রগতি এখনও রুমানিয়ার অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মার্কিণ মহিলা হেন্‌রিয়েটা রুমানিয়া পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, রুমানিয়ার মঠে বহু নারী সন্ন্যাস জীবন যাপন করিয়া থাকেন। রুমানিয়ার নারীরা বেশ স্বাস্থ্যবতী এবং

সৌন্দর্য্যও সাধারণতঃ মন্দ নহে। নারীরা সাধারণতঃ গভীরহৃদয়া, সন্তানবৎসলা এবং আতিথেয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা।

সহরে বালিকারা বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও তেমন প্রবল হয় নাই। কিন্তু চারুশিল্পে অধিকাংশ নারীই সমধিক দক্ষা।

যুগোশ্লাভিয়ার নারী

প্রাচীন মাসিডন, ক্রোশিয়া, শ্লাভনিয়া, বসনিয়া, হার্জগোভিনা, ডালমাসিয়া, শ্লোভানিয়া, সার্ব্বিয়া, এবং মন্টিনিগ্রো, এই কয়েকটি প্রদেশ লইয়া যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হইয়াছে। এই দুর্গম দেশ পাহাড় প্রাচীর বেষ্টিত। এই প্রদেশে বহু জাতির বাস। আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে এই যুগোশ্লাভিয়াকে সার্ব্ব ক্রোটশ এবং শ্লোভেন জাতির রাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। মন্টিনিগ্রোবাসীরা সাহস ও বীর্য্যে অকুতোভয়। সেজন্য ইহাদের স্বাধীনতা কেহ কখনও ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কজাতি সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সার্ব্বরা পাহাড় বেষ্টিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেইখানে তাহারা স্বাধীন অপরাজেয় রাজ্য গঠন করে। কিন্তু সমরশক্তিতে তুর্করা তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এই পাহাড় বেষ্টিত রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করিল। এবারেও সার্ব্বরা পরাজিত হইয়া স্কুটারী হ্রদের কাছে গিয়া নূতন রাজ্য গড়িয়া তুলিল। রাজধানীর নাম হইল কেটিনী। পরিশেষে উক্ত নগর মন্টিনিগ্রোর রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়। তুর্করা এ অঞ্চলেও আসিয়া উপস্থিত হইল। বীর মন্টিনিগ্রোবাসীরা প্রাণপণ শক্তিতে তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। তুর্করা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ উক্ত রাজ্য আক্রমণ

করিতে বিমুখ হইল না। শত শত বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তুর্কদিগের অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া যুরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জ মন্টিনিগ্রোবাসীদিগের সাহায্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

বহুশত বৎসরব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে এই জাতি বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহার শিক্ষা পায় নাই। কঠোর সংযত জীবন যাপনে তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং জাতীয় জীবনে পঞ্চশতবর্ষব্যাপী ভীষণ সমরপ্রণালীর যে ছাপ এই জাতির চরিত্রে সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

মন্টিনিগ্রোর পুরুষ সর্ব্বদা বন্দুক সঙ্গে রাখে। যুদ্ধবিদ্যা সকলকেই শিখিতে হয়। স্ত্রীপুত্রদিগকে ইহারা খুবই ভালবাসে। পুরুষ যুদ্ধ করিবে, নারী সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়া থাকিবে, ইহাই এদেশের চিরন্তন ব্যবস্থা। এদেশে মেয়ে জন্মিলে তাহা যেন দুর্ভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ, ইহাই মন্টিনিগ্রোর লোকদিগের ধারণা। মানুষ বলিতে তাহারা পুরুষকে বুঝে, নারীকে তাহারা মানুষের মধ্যেই গণনা করে না। এজন্য মানুষ গণনায় নারীর হিসাব পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। পুরুষ যুদ্ধ করিবে, অস্ত্র লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, ইহাই এই জাতির আদর্শ।

মন্টিনিগ্রোয় অভিজাত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। কৃষিই এদেশের প্রধান পেশা। অবশ্য কিছু কিছু শিল্প ব্যবসাও যে নাই তাহা নহে। কম্বল, কার্পেট, সিগারেট এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে বড় বড় কারখানা নাই। শূকরও এখানে ব্যবসা হিসাবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

মন্টিনিগ্রোর বিবাহ প্রথায় বৈচিত্র্য দেখা যায়। পাত্র ও পাত্রীর পুরুষ অভিভাবকগণই বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। সে বন্দোবস্ত হইয়া গেলে, নির্ব্বাচিত পাত্র যুগল বন্ধুসহ পাত্রীর বাড়ীতে আসিয়া

চেকোশ্লাভিয়ার নারীর বিলাস বসন

উপস্থিত হয়। সে সময়ে বরের হাতে পিষ্টক ও পুষ্প গুচ্ছ থাকে। বন্ধু যুগলের মধ্যে একজনের হাতে পিস্তল। বরের সহিত কন্যার শুভদৃষ্টি হইবামাত্র বন্ধু আমোদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পিস্তল ছুড়ে। ইহার পর কন্যার পিতাকে কন্যার মূল্য স্বরূপ বর কিছু টাকা দেয়। কন্যা ক্রয় প্রথা এদেশে বিদ্যমান।

রবিবারই বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত দিন। বিবাহের পূর্ব্বে বৃহস্পতিবার বর ও কন্যার গৃহে পিষ্টক প্রস্তুত হইতে থাকে। ইহাই ব্যবস্থা। সেই সকল পিষ্টক সহযোগে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের প্রীতিভোজ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বিবাহের দিন বর পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কন্যার গৃহে বিবাহ করিবার জন্য উপস্থিত হয়। কন্যাও পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হইয়া থাকে। একটি বেদীর সম্মুখে বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সেই সময় কন্যার কেশরাজির মধ্যে অর্থাৎ কবরীগুচ্ছের অন্তরালে একটি মুদ্রা সংগোপনে রক্ষিত হয়। এই মুদ্রা রাখিবার ব্যবস্থার অর্থ যে, জীবনে কন্যা স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও কাছে যেন অর্থের জন্য প্রার্থী না হয়।

শ্লাভ নারীদিগের পরিচ্ছদে বর্ণবৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। নারীর সাধারণতঃ নক্সা কাটা আঁটো বডিস্, পরিধানে ঘাঘরা, ছোট স্কার্ট। কিন্তু সে সকল পরিচ্ছদে রঙ্গের বাহার নয়ন মনোরঞ্জন।

তুর্কজাতি এই দেশে পুনঃ পুনঃ আপতিত হইয়াছিল বলিয়া বহু মুসলমান এখানে বসবাস করিতেছে। আদিম শ্লাভজাতি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। রোমান ক্যাথলিক মতেরই প্রাধান্য।

শ্লাভ নারীরা স্বাস্থ্যবতী, সর্ব্বক্ষণ গৃহকর্ম্ম নিরতা। ক্ষেত্রে মেয়েরা কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের দক্ষতা পুরুষের তুলনায় অনেক অধিক। নৌকা পরিচালনা, পথ তৈয়ার প্রভৃতি কার্য্যেও পুরুষ ও নারী সমানভাবে

যোগ দিয়া থাকে। শ্লাভনারীদিগের দেহের যৌবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ত্রিশ বৎসর বয়সেই নারীরা বৃদ্ধা সাজিয়া বসে। তবে যৌবনে শ্লাভনারীরা দেখিতে মনোহারিণী হয়। অতিরিক্ত সংখ্যায় সন্তান প্রসব করার ফলেই শ্লাভনারীদিগের দেহে যৌবন স্থায়ী হয় না। তবে যে সকল পরিবারের নারীদিগকে ক্ষেত্রে খামারে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহাদের যৌবন শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করে না। তাহাদের রূপলাবণ্য সত্যই চমকপ্রদ।

নারী সম্প্রদায়কে জনগণনার ব্যাপারে না ধরিলেও এদেশে নারী অবজ্ঞাত নহে। তাহারা দাসীর ন্যায় কাল যাপনও করে না। শ্লাভপুরুষরা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ বলিয়া বিদিত। কিন্তু শ্লাভনারীরা সেরূপ প্রকৃতির নহে। নারীর প্রতিও প্রতিহিংসাবৃত্তি পুরুষরা কখনও গ্রহণ করে না। স্ত্রীবধ মহাপাপ বলিয়া তাহারা মনে করিয়া থাকে। এজন্য শ্লাভনারী পথে একা বাহির হইলেও নিরাপদে থাকে।

হাট বাজার শ্লাভ নারীর অধিকার ভুক্ত। পুরুষ বাজারে থাকে না। বিকিকিনির যাবতীয় কার্য্য নারীরাই চালাইয়া থাকে। পুরুষজাতি বাজারে পদার্পণ পর্য্যন্ত করে না।

শ্লাভজাতি গাছ শিকড়, প্রভৃতির ভক্ত। তাহারা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক পীড়ায় কোন না কোন গাছ বা শিকড় প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করিলে রোগ নিরাময় হইবে। এই চিকিৎসা বিদ্যায় নারীর একচ্ছত্র অধিকার। ডাইনী, ইন্দ্রজাল প্রভৃতিতে বিশ্বাসের সীমা নাই।

নারী যদি অসতী হয়, অর্থাৎ কোনও নারী ব্যভিচার করিয়াছে ইহা যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে শ্লাভরা তাহার নাসিকা কর্ত্তন করিয়া দিবে। তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা। শিক্ষার সংস্কার ও প্রগতি যুগের প্রভাবেও এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

যুগোশ্লাভিয়ায় যে সকল মুসলমান বসবাস করে, তাহারা সকলেই তুর্ক নহে। ইহারা সার্ব্বিয়ান বলিয়া গণিত এবং সার্ব্বিয়ান ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা সার্ব্বিয়ান প্রথা মানিয়া চলে। বহু গৃহের নারীরা মুসলমানের মত বোর্খা ও পর্দ্দা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইদানীং যাহারা পর্দ্দা ও বোর্খার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহারা গণ্ডে, ওষ্ঠে বর্ণবিন্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রোজব্লুমের ব্যবহার এখন বেশ চলিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সার্ব্বিয়ান নারীবা তাম্রকূট ধূমপান করিয়া থাকে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সার্ব্বিয়ান নারীরা ঐরূপ প্রথার ঘোর বিদ্বেষী।

শ্লাভ দেশে একটা ব্যবস্থা আছে যে, নারীরা ইচ্ছা করিলে পুরুষের অধিকার সম্ভোগ করিতে পাবে। কিন্তু সেজন্য কঠিন প্রতিজ্ঞাও করিতে হয়। যে নারী পুরুষের অধিকার ভোগের বাসনা করে, তাহাকে আজীবন কুমারী থাকিতে হইবে। চিরকৌমার্য্যকে বরণ করিয়া, পুরুষের পরিচ্ছদে অঙ্গ ভূষিত করিতে হইবে। মাথার চুল পুরুষের মত ছোট করিয়া ছাটিয়া সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ করিয়া বেড়াইতে হইবে। এইভাবে যে নারী পুরষ হইয়া থাকিতে চাহে, পৈতৃক সম্পত্তির সে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে।

যুগোশ্লাভিযায় এই প্রকার নারীপুরুষ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই তুর্কসেনাদলে কাজ করিয়া থাকে। একবার নারী পুরুষ হইলে, তাহার পক্ষে নারী হইবার অধিকার লাভের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং বিবাহ তাহার পক্ষে অসম্ভব। যদি এইরূপ নারী-পুরুষ প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া কোনও পুরুষের সহিত মিলিত হয় এবং তাহার ফলে সন্তানসম্ভবা হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রসূত সন্তান সহ হত্যা করা হইয়া থাকে। ইহাই প্রচলিত বিধি।

সন্তানের পিতৃত্বও যদি কোনওক্রমে নিরূপিত হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষেরও অব্যাহতি লাভ ঘটে না। তাহারও প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।

যুগোশ্লাভ সমাজে প্রাচীন রীতির পরিচ্ছদপ্রীতি অটুট অবস্থায় রহিয়াছে। জমকালো বৈচিত্র্যবহুল পরিচ্ছদের প্রতি সমান অনুরাগ বিদ্যমান। আধুনিক রুচির পরিচ্ছদ উৎসব উপলক্ষে ধারণ করিলে বংশের সম্ভ্রম হানি ঘটে, এ সংস্কার বর্ত্তমান যুগেও সমভাবে রহিয়াছে।

সমাজের সকল স্তরের নারীই শিল্পকার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন এদেশে হইয়াছে। কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে শিক্ষার প্রসার বাড়ে নাই। তাই এখনও এদেশের নারী সমাজ শারীরিক পরিশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই।

সুইস মহিলা

সুইটজারল্যাণ্ডের সুইস জাতি সাধারণতঃ সবল ও সুস্থদেহ বিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষদিগের দেহ সবল ও সুসমঞ্জস। কৃষিকার্য্যে যাহারা জীবিকার্জ্জন করে তাহাদের মত সুস্থ সবল ব্যক্তি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তবে তাহাদিগের পরমায়ু গড়পড়তা ৪০ বৎসর। স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক। স্ত্রীলোক শতকরা ৫১, পুরুষ ৪৯।

সুইসজাতি শিল্পপ্রবণ। লেস ও চিকণের কাজে তাহাদিগের প্রসিদ্ধি বিশ্ববিখ্যাত বলিতে হইবে। সহস্র সহস্র নারী লেস ও চিকণের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুইস নারীরা শিল্পকার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল কাজ শিখাইবার জন্য বহু বিদ্যালয় সুইটজারল্যাণ্ডে আছে। সুতীর বস্ত্র ও পশমী কাপড়ের কাজ ধনী নির্ধন সকল গৃহের নারীরা করিয়া থাকে।

সুইস নারীরা দীর্ঘাকারা নহে। কেশও খুব দীর্ঘ নহে, মধ্যম। দেহের বাঁধনকে দৃঢ় বলা চলে। লালিত্যের অভাব দেখা যায়। গৃহকর্ম্মে নারীরা বিশেষ নিষ্ঠাবতী। পুত্রকন্যার লালনপালন এবং পুরুষের কাজে সহযোগিতা নারীরা সর্ব্বদা করিয়া থাকে।

বিবাহ চুক্তিবদ্ধ ভাবে হইয়া থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সোলেনামা দিয়া বিবাহবন্ধনের পাকাপাকী ব্যবস্থা করিতে হয়। ধনিগৃহের

মহিলারা সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকেন। শিক্ষায় সুইসনারীদিগের সবিশেষ অনুরাগ। শিক্ষাদান ব্যাপারে নারীর পটুতাও অসাধারণ।

এদেশে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তবে পারিবারিক অবস্থা ও ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে। শিক্ষয়িত্রীদিগের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাসদন আছে। নির্দ্দিষ্ট বয়সে তথায় প্রবেশ করিতে হয়। ১৪ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়সে নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে হয়। দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর পরীক্ষার উপাধি মিলে।

এইদেশের নারীরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে। টুপী মাথায় পরিতে হইবে। বিবাহিতা নারীরা শ্বেতবর্ণের টুপী পরিধান করেন। কুমারীদিগের জন্য কৃষ্ণবর্ণের টুপী।

সুইস নারীরা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির বিশেষ চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নারীত্ব বর্জ্জনের পক্ষপাতিনী নহেন। পুরুষ বনিবার চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে নাই। ঘরের শুচিতা অব্যাহত রাখিতে তাঁহারা সদাই উন্মুখ।

সোভিয়েট অঙ্গনা

জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান বাক্য "কার্চ্চি, কুচি, কিন্‌ডার"—গির্জ্জা, রন্ধনাগার এবং সন্তান ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হিটলারী শাসনে জন্মলাভ করিয়াছে। এই তিন ব্যাপারে জার্ম্মাণ নারীর অধিকার, তাহার বেশী অধিকার বর্ত্তমান জার্ম্মাণ নারীর নাই। ইংলণ্ডেরও প্রাচীন প্রচলিত কথা—"নারীর স্থান গৃহে" এখনও চলিতেছে। কিন্তু সোভিয়েট রুসিয়ায় নারী পুরুষের সহিত জীবন যাত্রার যাবতীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ সমান অধিকার লাভ করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, "ইউ, এস্, এস্, আর এ, কি অর্থনীতিক, ষ্টেট সংক্রান্ত কার্য্যে, সামাজিক, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রনীতিক সকল ব্যাপারেই নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইল।"

এই অধিকার বলে নারী সকল কার্য্যই করিতে পাইবে, পুরুষের ন্যায় সমান পারিশ্রমিক লাভ করিবে। পুরুষের সমতুল্য শিক্ষার দ্বার নারীর জন্য উন্মুক্ত। শুধু উন্মুক্ত নহে, তদনুরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে। পুরুষের জন্য যেরূপ বিশ্রাম বা অবকাশ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, নারীও তদনুরূপ অবকাশ লাভ করিয়া বিশ্রাম করিতে পাইবে। এ সব ব্যবস্থা ব্যতীতও সোভিয়েট সরকার সন্তানসম্ভবা নারী এবং সন্তানজননীর স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও করিয়াছেন। নারী সন্তানসম্ভবা হইলে

তাহাকে পূরা পারিশ্রমিক সহ বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। অসংখ্য প্রসূতি আগার নারীদিগের জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। ধাত্রী মন্দির সমূহ এবং কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে শিশুশিক্ষার বন্দোবস্তও রুস সরকার করিয়াছেন।

মিঃ প্যাট্ শ্লোয়েন নামক জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক সোভিয়েট রুসিয়ায় ৬ বৎসর বসবাস করিয়া অন্তরঙ্গভাবে সোভিয়েট রুসিয়ার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি "Soviet Democracy" নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বৃটিশ জন সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমি সোভিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে দেখিয়াছি যে, সোভিয়েট রুসিয়ায় নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়াছে।" তিনি গল্পচ্ছলে সোভিয়েট ছাত্রীদিগের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের তরুণীরা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অর্থার্জ্জন করে, কিন্তু বিবাহ হইয়া গেলেই আর স্বয়ং অর্থোপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করে না। একথা শুনিয়া সোভিয়েট ছাত্রীরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়াছিল।

সোভিয়েট তরুণীরা এরূপ জীবনাদর্শ কল্পনা করিতেই পারে না। স্বামিলাভ এবং গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিবার জন্যই নারী প্রথম জীবনে অর্থার্জ্জন করিবে। তারপর তাহার অর্থার্জ্জনের প্রয়োজন নাই, ইহা তরুণী সোভিয়েট নারীরা অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান রুসিয়ায় নারী যে পুরুষের তুলনায় হীন, এরূপ মনোভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। রুসিয়ার কোনও লোক এমন অসম্ভব ব্যাপার কল্পনা করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে। মিঃ শ্লোয়েন একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা হইতেই ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হইবে। মস্কো

সহরে ভূগর্ভে একটা কাজ করিবার প্রয়োজন ঘটে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ভূগর্ভে কাজ করা নারীদিগের পক্ষে অকল্যাণকর হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে নারী শ্রমিকদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তখন একদল তরুণী সোভিয়েটনারী দাবী জানায় যে, তাহাদিগকে এই কার্য্যে গ্রহণ করা হউক। সে প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এক নারী বাহিনী গঠিত হইয়া পুরষদিগের সহিত সমানভাবে সেই কার্য্য সম্পাদন করিল। তাহাতে পুরুষদিগের তুলনায় নারীদিগের কার্য্য সমানই ত্রুটি বর্জ্জিত হইয়াছিল।

যদি সোভিয়েট রুসিয়ায় এমন প্রশ্ন উঠে যে, কোন একটা কার্য্য নারীদিগের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে, অমনই নারীর দল সেই কার্য্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হইবে এবং বেশ সাফল্যের সহিতই সে কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেলিবে। এইভাবের মনোবৃত্তি বর্ত্তমান সোভিয়েট রুসিয়ায় নারীর কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে।

"দুর্ব্বলা" বলিয়া সকল সভ্যসমাজই নারীকে সেইরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। এজন্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এমন অনেক শ্রমশিল্প বিভাগ আছে, যাহাতে অবলা বা দুর্ব্বলা নারীর প্রবেশাধিকার নাই। ইহা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সুস্পষ্ট। কিন্তু সোভিয়েট রুসিয়ায় ব্যবস্থা বিভিন্ন। সেখানে পুরুষের ন্যায় নারীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থা এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যে, সকলপ্রকার শ্রমশিল্পেই নারী পুরুষের ন্যায় সমানভাবে প্রবেশাধিকার পাইয়া আসিতেছে। কদাচিৎ কোনও ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজতন্ত্রবাদী দেশ সমূহে নারীর দেহ পুরুষের ন্যায় সুগঠিত করিবার ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট রুসিয়ায় "দুর্ব্বলা" নারী এই আখ্যা অপরিজ্ঞাত। সেখানে নারী বরং প্রবলা। সোভিয়েট রুসিয়ায় নারীরা

যাহাতে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় আহার্য্য পায়, তাহার জন্য কর্ম্মক্ষেত্র-সমূহের সন্নিকটে অসংখ্য ভোজনালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রমিকনারী আহারের জন্য গৃহে গিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিবে, এমন অব্যবস্থা রুসিয়া ঘটিতে দেয় নাই।

রুসিয়ার মাতৃসমাজ সন্তান পালনের জন্য কোনওরূপ অসুবিধা যাহাতে ভোগ না করে তাঁহার প্রচুর ব্যবস্থা সোভিয়েট সরকার করিয়াছেন। বহু ধাত্রীমন্দির এবং ক্রীড়া প্রাঙ্গন সোভিয়েট শিশু সন্তানগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোভিয়েটমাতার শ্রমের ভার লাঘবের জন্য কর্তৃপক্ষ সর্ব্বদা সচেতন থাকেন। সন্তান পালনের জন্য রুসিয়ার সন্তানবতীদিগের কোনও দুর্ভাবনা সহ্য করিতে হয় না। ধাত্রীরা শিশুদিগকে আহার্য্য দেয়, প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা করে। বিদ্যালয় সমূহে শিশুদিগের তত্বাবধান করা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ধাত্রীমন্দির ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষালয় সমূহের প্রাচুর্য্যের ফলে পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ, ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে। মিঃ শ্লোয়েন লিখিয়াছেন, "এরূপ অভিজ্ঞতা আমার দীর্ঘকাল রুসিয়া বাসে আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। বরং শিক্ষিতা ধাত্রী ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের অধীনে যে সকল শিশুসন্তান, মাতার কর্ম্মময় জীবনের নির্দ্দিষ্ট কয় ঘণ্টা যাপন করে, তাহাতে মাতার স্নেহ সন্তানের প্রতি হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণই আমি দেখিতে পাই নাই। বরং শ্রমাবসানে জননী যখন তাহার সন্তানকে কাছে পায় তখন মাতার আনন্দ ও শিশুর আকর্ষণ প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।"

সোভিয়েট রুসিয়ায় সন্তানসম্ভবা নারী পূর্ণ বেতনে ৪ মাস বিশ্রাম লাভ করে। যদি চিকিৎসক এমন বুঝেন যে, লঘু শ্রমে প্রসূতির কোনও ক্ষতি হইবে না, তবে সেইভাবের কার্য্য তাহাকে দিবার ব্যবস্থা আছে।

সেজন্য পারিশ্রমিকের হ্রাস ঘটে না। উপযুক্ত সময়ে প্রসূতি কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলে, তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মভারও লঘু করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। প্রসূতির সম্বন্ধে যাবতীয় ঔষধ পথ্য অথবা চিকিৎসকের ভিজিট লাগে না। বিনামূল্যেই তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

সোভিয়েট সরকার বিপ্লবের প্রথম অবস্থা হইতেই বিবাহিতা ও কুমারী জননীর সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে কোনও সন্তানই ললাটে জারজ সন্তানের কলঙ্ক কালিমা মাখিয়া জীবন-যাত্রার পথে অগ্রসর হয় না।

সোভিয়েট সরকার এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, বিবাহ ব্যাপারটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সর্ত্ত হইবে। সুতরাং বিবাহ এবং তজ্জনিত সন্তানসন্ততি পরস্পরের স্নেহ ভালবাসার ভিত্তির উপরে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সোভিয়েট সরকার সেই বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন। যাহারা বিবাহের পর পরস্পর স্বামিস্ত্রীরূপে থাকিতে অনিচ্ছুক, আইনের বন্ধনে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধ অভিমত সোভিয়েট সরকার পোষণ করিয়া থাকেন। এজন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল করা হইয়াছে। তবে বিবাহের পর যদি সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে মাতা ও পিতাকে তুল্যভাবে তাহাদের ভার বহন করিতে হইবে। বিবাহ বিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়। বিবাহ রেজেষ্ট্রিকৃত হউক, অথবা না হউক, প্রত্যেক জনক জননীকে সন্তান পালনের দায়িত্ব লইতেই হইবে। পিতা যদি স্বতন্ত্রভাবে থাকে, তাহা হইলে মাতাই সন্তান পালনের ভার পাইবে—ইহা সে দেশের আইন। অবশ্য পিতাকে নিয়মিতভাবে সন্তান পালনের অর্থ যোগাইতে হইবে। এই অর্থ সামান্য নহে। পুরুষকে তাহার উপার্জ্জনের শতকরা ৩০ ভাগ একজন সন্তানের জন্য দিতে হইবে। দুইটি সন্তান হইলে শতকরা

৪০ এবং তিন বা ততোধিক সন্তানের জন্য শতকরা ৫০ দিতে হইবে। যতদিন সন্তানরা উপার্জ্জনক্ষম বয়স লাভ না করে, ততদিন এই ব্যয়ভার পিতাকে বহন করিতেই হইবে। এইভাবে দম্পতির দায়িত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোনও নারী গর্ভপাত করিতে পাইবে না। এই নিয়ম ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। উহা অবৈধ। তবে নারীর স্বাস্থ্য অথবা বংশানুক্রমিক কোনও পীড়ার আশঙ্কা যদি থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিধানমত গর্ভপাত অনুমোদিত। অবৈধ গর্ভপাত এবং তাহার ফলে নারীর স্বাস্থ্য চূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া সোভিয়েট রুসীয়া নারীর জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাতে নারীর মর্য্যাদা বা তুল্যাধিকার ব্যাহত হয় নাই।

মিঃ শ্লোয়েন লিখিয়াছেন, "সোভিয়েট রুসিয়ায় জারজ সন্তানের জন্ম সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে। বেকার সমস্যা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছ। উহার পুনরার্ভিাবের আশঙ্কা পর্য্যন্ত নাই। সমাজ জীবনের এমন ব্যবস্থা এ দেশে হইয়াছে যে, লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হেতু বেকার অবস্থা ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। পুরুষ সন্তান ধারণ করে না, নারীকে তাহা করিতে হয় বলিয়া প্রগতিবাদী পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অনেক স্থানে যে প্রতিবাদ উত্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সোভিয়েট রুসিয়ার নারী সমাজ তেমন প্রতিবাদের কথা এ যুগে কল্পনাও করিতে পারে না। তাহারা স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ না করিয়া যতগুলি সন্তান ধারণ করিতে পারে, হৃষ্টচিত্তে তাহা প্রসব করিয়া থাকে। কারণ, এজন্য তাহাকে কোনও প্রকার অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না।"

সোভিয়েট রুসিয়ায় নারীর স্থান গৃহে না হইলেও গৃহের প্রতি মাতৃত্বের প্রতি, সন্তান পালনের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব নাই।

সোভিয়েট রুসিয়া নারীকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া পত্নীত্ব বা মাতৃত্বকে শ্রদ্ধার আসন দিতে কৃপণতা করে নাই। মাতা, পত্নী প্রচুর সম্মান সোভিয়েট রুসিয়ায় পাইয়া থাকেন।

সোভিয়েট রুসিয়া মানব জীবনকে চরম সার্থকতার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টায় নানাবিধ আইনের পরিবর্ত্তন করিতেছেন। প্রোলিটেরিয়েট রুসিয়া সেই আদর্শে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ যে সত্য এবং মানুষের অপেক্ষা সত্য আর কিছু নাই, ইহা রুসিয়া অবধারণ করিয়াছে। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে সরলতম নিয়মাবলী ব্যবস্থিত হইয়াছে। বিবাহের অর্দ্ধঘণ্টা পরে যদি দম্পতির কেহ বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে চাহে, তাহাতে কোন বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। একজন আসিয়া বিবাহবিচ্ছেদ আপিসে নাম স্বাক্ষর করিয়া বলিলেই হইল, বিবাহিত জীবনের অবসান হইল। কিন্তু এত সরল করিয়া দিলেও সোভিয়েট রুসিয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা নগণ্য। দাম্পত্য জীবনের প্রতি প্রোলিটারিয়েট রুসিয়ার শ্রদ্ধা অসীম।

সোভিয়েট রুসিয়া ধর্ম্মকে একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেও, প্রোলিটারিয়েট রুসিয়া ধর্ম্মপ্রবণ। এখনও বহু সহস্র ধর্ম্মালয়ে নিত্য লক্ষ লক্ষ উপাসনাকামী নরনারীর সম্মেলন ঘটে। রুসিয়ার নারী সমাজ চরিত্রের নিষ্ঠা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক। মার্কিণ কামিনীদিগের ন্যায় তাহারা প্রজাপতি সাজিবার সময় ও সুবিধা পায় না। সোভিয়েট রুসিয়ার নারী সমাজ সকল বিষয়েই সুশিক্ষা পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে বিচারক ব্যবহারাজীব, শিক্ষয়িত্রী, সাহিত্যিকের অভাব নাই।

নারীরা পুলিসের কার্য্যে, সেনাদলে যোগদান করিয়া থাকে। দেশের কল্যাণ, জাতির কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির কল্যাণ কামনা

তাহাদের অন্তরে দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিশ্ব প্রগতিতে রুসিয়ার নারী সমাজ যেভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য দেশের কোথাও রুসিয়ার প্রগতিশীল নারী সমাজের দেখা ব্যাপকভাবে পাওয়া যাইবে না।

রুসিয়ার নারী সমাজে সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে। রুসনারী স্বভাবতঃ তেমন প্রগলভা নহে। তাহাদের হৃদয় যেমন গভীর তেমনই কল্পনা-প্রবণ। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, দয়া মায়া কোনও বিষয়েই রুসিয়ার নারী পশ্চাৎবর্ত্তিনী নহে। সোভিয়েট রুসিয়ার কার্য্য ও সমাজ জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইলেও মনুষ্যত্ব চর্চ্চার দিকে সোভিয়েট রুসিয়া খরদৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাহারই ফলে রুসিয়ার নারী সমাজ সমুন্নতস্তরে উত্থিত হইয়াছে।

তুরস্ক নারী

এক সময়ে তুর্কীর হারেম ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল। এখন সে হারেম নাই। সে বোরখা অদৃশ্য হইয়াছে। মুস্তাফা কামালপাশা যে দিন হইতে নবীন তুর্কীর শাসন তরীর কর্ণধার হইয়াছেন, সেই দিন হইতে তুরস্কের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার শাসনাধীনে তুর্ক মহিলারা এখন স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহাদের অঙ্গে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ। প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহারা স্বেচ্ছামত যত্র তত্র গমনাগমন করিয়া থাকেন।

বিগত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তুর্কীর হারেমে কামিনীদিগের মধ্যে মুক্তির আন্দোলন আরব্ধ হয়। তখন হইতে গোপনে, সন্তর্পণে নারী অবরোধ ও ধর্ম্মবন্ধনের বিরুদ্ধে জাতি জাগ্রত হইতে আরম্ভ করে।

১৯০৬ খষ্টাব্দে "ফুসিয়ান প্রোগ্রেস" নামক এক সমিতি ছিল। সেই সমিতিতে আমিনা সেনাই হাম্নম নামে এক মহিলা সদস্য ছিলেন। চিন্তাশীলা ও বিদুষী লেখিকা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইহার পর যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তখন অনেক তুর্ক মহিলা ইহাতে যোগদান করেন। কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদের জন্য তাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন।

সে সময়ে "তা নিন" নামে একখানি পত্র "ফুসিয়ম প্রোগ্রেস্" সমিতির মুখপত্র ছিল। হালিদে এদিব নাম্নী এক বিদুষী মহিলা উহার সম্পাদিকা

হন। নারীর মুক্তি ও পুরুষের সহিত সমান অধিকারের বিষয় লইয়া ঐ পত্রে বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

উল্লিখিত সময়ে কনষ্টাণ্টিনোপলে "তয়াসি নিস্‌ওয়াস" নামক এক নারী সমিতি সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার সদস্য সমূহ নারী ছিলেন। 'নাকী হাস্থম নাম্নী এক মহিলা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ওয়াকফ্ (ধর্ম্মসম্পর্কে সম্পত্তির) বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাসমরে নারী শুশ্রূষাকারিণীর দল তুরস্কে গঠিত হয়। যুদ্ধশেষে নূতন তুরস্কের অভ্যুদয় হয়। তখন পরিচ্ছদ, ধর্ম্মবিষয়, সমাজে নারীর মিশ্রণ ব্যবস্থা, নারীর স্বাবলম্বন প্রভৃতি ব্যাপারে তুরস্ক অভিনব সংস্কার পন্থা নির্দ্দেশ করে।

বিবাহ ব্যাপারে সংস্কার ঘটিল। পুরুষ বা নারী যদি বিবাহিত থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয়বারের বিবাহ বে-আইনী ও বাতিল হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা তুরস্কে বন্ধ হইয়া যায়। কোরাণের আদেশ পুরুষ ৪টি বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তুরস্কে তাহা এখন অচল। তালাক দিবার অধিকার পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান।

অবগুণ্ঠন স্বেচ্ছায় নারীরা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অবগুণ্ঠন দাসীত্বের পরিচায়ক বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পুরুষদিগের ন্যায় নারীদিগের স্বতন্ত্র ক্লাব আছে। তথায় নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকেন। ভোজ বা নিমন্ত্রণ ব্যাপারে পুরুষ ও নারী একত্র সমাবিষ্ট হইয়া থাকেন।

তুর্কনারীরা এখন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সংবাদ পত্র সেবিকা এবং লেখিকারূপে সমাজ সেবা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীরা সগৌরবে শিক্ষা করিতেছেন। মহিলা ডাক্তার শিক্ষয়িত্রী, মহিলা ব্যবহারাজীব সেখানে বহু সংখ্যায় আছেন।

তুরস্কের ডাকঘরে শত শত কিশোরী এখন কার্য্য করিতেছেন। সরকারী নানা বিভাগে নারী আছেন। ব্যাঙ্ক ও সদাগরী আপিস সমূহে তুরস্ক মহিলার অভাব নাই।

তুর্কনারী অনেক বিষয়ে য়ূরোপীয় অন্যান্য দেশের নারী অপেক্ষা বহু অধিকার লাভ করিয়াছেন। শিক্ষাব্যাপারে তুর্কনারীরা জগতের মুসলমান নারীগণের অগ্রগণ্যা। তুরস্কের বর্ত্তমান ইতিহাসে বহু নারীর নাম চিরদিনের জন্য স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

সকল বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াও তুরস্কের নারীরা সংযম ও শালীনতা ভ্রষ্টা হন নাই। অকারণ সঙ্কোচ ও লজ্জা না থাকিলেও, স্বভাবতঃ তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলা নহেন।

এসিয়া মাইনরের নারী

ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান এসিয়া মাইনর বলিয়া খ্যাত। এই দীর্ঘ ভূখণ্ডে সর্ব্বজাতির মিলন ঘটিয়াছে বলা যায়। এই অঞ্চল অটোমান শক্তির অধীন। প্রায় ৪ শত বৎসর ধরিয়া ওসমানলি তুর্ক জাতির শাসনাধীন রহিয়াছে। এই অঞ্চলে বহু বিভিন্ন প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক জাতি বাস করে। অনেক বিদেশী বিজয়ী জাতির বংশধরগণও এখানে বাস করিতেছে।

ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে এই অঞ্চলের জাতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, খৃষ্টান বা ইহুদী। এসিয়া মাইনরকে রুম নামে অভিহিত করাও হইয়া থাকে। রুমের সরকার কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ সাধারণতঃ করেন না।

মুসলমানদিগের মধ্যে ওসমানলি সম্প্রদায়ই প্রধান। ইহা ব্যতীত সার্কেসিয়ান্, জার্জ্জিয়ান্, কুর্দ্দ, তাতার তুর্কোমান য়ুবুক প্রভৃতি সম্প্রদায়ও আছে। খৃষ্টানগণের মধ্যে আর্ম্মেনিয়ান্ গ্রীক ও রোমান ক্যাথলিক আছে।

অভিজাত গৃহের মুসলমান ও খৃষ্টান নারীরা অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। স্মির্ণার নারীরা সর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী। শুনা যায়, এমন সুন্দরী পৃথিবীর অন্যত্র দুর্ল্ভ। এই নারীদিগের চক্ষু অতি চমৎকার।

প্রত্যেকের ভ্রূযুগল যেন তূলিকার দ্বারা অঙ্কিত। গৌরবর্ণ দেহ স্নিগ্ধ কান্তিতে উদ্ভাসিত।

ওস্‌মানলি জাতির নারীদিগের গঠন বৈচিত্র্যে ও গাত্রবর্ণে পার্থক্য আছে। নানাজাতির সংমিশ্রণে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বলিয়া এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। শারীরিক প্রসাধন অঙ্গ সজ্জা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের নারীদিগের যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তাহাদের কেশরাজিতেও নানাপ্রকার বর্ণানুরঞ্জনের ব্যবস্থা দেখা যায়।

মুসলমান নারীরা প্রত্যহ স্নান করিয়া থাকেন। এই স্নান প্রক্রিয়া অল্পসময়ের মধ্যে সমাধা হয় না। ইহারা এমনই স্নানানুরাগিণী যে, সেজন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মেও অনেক সময় উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলের মুসলমান নারীরা বর্ত্তমান যুগেও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন নাই। হ্যাট ধারণ প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। হ্যাটের প্রতি বিরাগই প্রবল। ওড়নার দ্বারা মস্তক ও মুখমণ্ডল আবৃত করিবার প্রথা এখনও মুসলমান নারী সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে যে ঘাঘরা তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাহার ঝুল হাঁটুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত—পূর্ব্বে পদতল পর্য্যন্ত ঘাঘরার ঝুল ছিল। ওড়নার উপর অনেকে "কেপ" ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কেপ পৃষ্ঠদেশে বেণীর মত দোদুল্যমান থাকে। এই কেপ ব্যবহার করেন ধনীর দুলালী কন্যা বা গৃহিণীরা।

মুক্ত প্রান্তরে বনভোজন প্রথা মুসলিম নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। সেই সময় তাঁহারা দীর্ঘ কোটের দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া থাকেন। অবগুণ্ঠন বা ওড়নার দ্বারা ইঁহারা মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখেন না।

বর্ত্তমান যুগে নারী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। ধনীর ঘরে ইহার প্রচলন যত অধিক, দরিদ্র গৃহস্থ গৃহে তেমন প্রসার এখনও হয় নাই। কিন্তু ধনী গৃহের কন্যারা এখনও উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ইউরোপের

অন্যত্র যাইতে পান না। সে ব্যবস্থা এ সমাজে এখনও চলে নাই। ধনিগৃহের কন্যারা গৃহে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন—বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাও শিক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার রীতি এখনও অপ্রচলিত।

মুসলমান নারী সমাজে অনেক শিক্ষিতা মহিলা সাহিত্যসেবা করিয়া থাকেন। তুর্কী সাহিত্য পরিপুষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা য়ুরোপীয় ভাষার বহু গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। হালি হালুম নাম্নী একজন শিক্ষিতা মহিলা আমেরিকার নারী কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই মহিলার তুর্কী ভাষায় ইউরোপীয় গ্রন্থের অনুবাদ আছে। সুলতান তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া এমন আনন্দ লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে উপাধিভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই মহিলা দেশ বিদেশে সমাদর লাভ করিয়াছেন।

এসিয়া মাইনরের খৃষ্টান ও ইহুদী সমাজে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। যুবক ও বালকদিগের ন্যায় বালিকা এবং কিশোরীরাও সেই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

এসিয়া মাইনরের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ওস্‌মানলি সম্প্রদায় বাস করিয়া থাকে। বৈদেশিক বিবাহের ফলে ইহাদের মধ্যে বর্ণসঙ্করতার বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র উপকূল হইতে দূরে যে সকল অঞ্চল অবস্থিত, তথায় বৈদেশিক সংস্রব বিশেষ ঘটে নাই। তত্রত্য সার্কেসিয়ান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ে বিদেশীয় শোণিত সংস্রব তেমন নাই। তাই সে সকল অঞ্চলে বিবাহ ব্যাপারে প্রাচীন নিয়মের বাঁধন এখনও বিদ্যমান। ইহার ফলে প্রাচীন রীতিনীতি, আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই রহিয়াছে।

এতদঞ্চলের নারীরা ক্ষেতখামারের কাজ করিয়া থাকে। গৃহে চরকা ও তাঁতের প্রচলন আছে। পশমী ও সুতার বস্ত্র বয়ন, কার্পেট তৈয়ার প্রভৃতি কার্য্য মেয়েরাই করিয়া থাকে। গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্যে নারীদিগের দক্ষতা প্রশংসনীয়। আলস্য কাহাকে বলে, তাহা এই স্থানের নারীদিগের অজ্ঞাত। যে সকল গ্রামে বৃক্ষ, লতার বাহুল্য নাই, তথায় নারীরা জ্বালানি কাষ্ঠ ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়।

এই প্রদেশের পুরুষরা নারীদিগের অধিকার বা ব্যক্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে নাই। নারীর দেহ, মন, স্বাধীন সত্তা আছে, ইহা পুরুষরা মানিয়া থাকে। এজন্য এতদঞ্চলের নারীদিগকে বঞ্চনা সহ্য করিবার দুর্ভাগ্য বহন করিতে হয় না। নারীরা তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। পুণ্য কামনায় তাঁহারা উপবাস ব্রত পালন করিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে পুরুষদিগের ন্যায়, মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনায় নারীও প্রার্থনা করিবার অধিকারিণী। মসজেদে প্রবেশও নারীর পক্ষে রুদ্ধ নহে। তবে নারীরা সাধারণতঃ মসজেদে গমন করেন না। কিন্তু মসজেদে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। শৈশব হইতেই ছেলে ও মেয়েরা ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ মুখস্থ করিয়া থাকে। কোরাণ পাঠের পর যখন তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে প্রমাণিত হয়, তখন তাহাদিগকে "হাফেজ" উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এসিয়া মাইনরের মুসলমান সমাজে অন্তঃপুর আছে। স্বামী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যতীত অপর কোনও পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পায় না। অপর পুরুষের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয়, মেলা মেশা নিষিদ্ধ। নারী সম্বন্ধে কড়া শাসনের ব্যবস্থা সত্ত্বেও, গৃহে নারীর উপরেই কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পিত। অন্তঃপুরে নারীর অবাধ স্বাধীনতা। সংসারের কোন কার্য্য সম্বন্ধে গৃহ কর্ত্রীকে কখনও কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

বহু বিবাহ এসিয়া মাইনরের মুসলমান সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ পুরুষই একবার মাত্র বিবাহ করিয়া থাকে। সপত্নীর দাবী এখানকার মুসলমান সমাজে অবিদিত বলিলেই হয়। স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ এজন্য সাধারণতঃ নিবিড়। স্থানীয় মুসলমান সমাজ নারীর স্বাধীন সত্তার প্রতি এমন মর্য্যাদা পোষণ করে যে, কোনও বাঁদী যদি ঘটনাক্রমে গৃহস্বামীর অঙ্কলক্ষ্মী হওয়ার ফলে সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে সেই বাঁদীকে অন্যত্র কখনই বিক্রয় করা চলিবে না। গৃহস্বামী বাধ্য হইয়া সেই বাঁদী ও তাহার সন্তানকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। বৈধ সন্তানের ন্যায় বাঁদীর সন্তানও পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

এসিয়ামাইনরের বিবাহ চুক্তিনামার মত। স্বামী দলিল লিখিয়া দেয়, সে বংশ মর্য্যদা এবং অবস্থা হিসাবে স্বামী যাবজ্জীবন স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবে। যদি ঘটনাক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেই হইবে, অধিকন্তু বিবাহের সময় যে সকল অর্থ সম্পদ দিবার সর্ত্ত থাকে, তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়। অর্থাৎ বিবাহবন্ধন বিচ্যুতা স্ত্রী যাবজ্জীবন যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোনও কষ্ট না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইয়া থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ব্যবস্থা আদৌ জটিলতা পূর্ণ নহে। কয়েকজন সাক্ষী ডাকিয়া তিনবার স্বামীকে "তালাক" শব্দটি উচ্চারণ করিতে হয়। অমনই বিবাহ বন্ধন বাতিল হইয়া যায়।

ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু কতকগুলি অবস্থায় স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে যদি প্রথমা পত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ না করে, তাহা হইলে পুরুষ অন্য পত্নী গ্রহণের অধিকারী হয়। নচেৎ অন্য কোনও উপায় নাই। এই

ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত ইহুদী সমাজে বহু বিবাহ অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। দম্পতির সন্তান যদি জন্মগ্রহণ নাই করে, সেরূপ অবস্থায় পোষ্যপুত্র গ্রহণই বিধি।

ইহুদীদিগের বিবাহেও চুক্তিনামার প্রভাব আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ বিধিও মুসলমানদিগের অনুরূপ। স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি, স্বামী আটক করিবার অধিকারী নহে।

এসিয়ামাইনরে ইহুদী ও মুসলিম সমাজে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইয়া থাকে। প্রাপ্তযৌবনার বিবাহ আদৌ প্রশস্ত নহে। যৌবন সমাগমের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত। বিবাহ ব্যাপারে পিতামাতাই সব। মেয়েদের কোনও কথা এ ব্যাপারে চলে না। বিবাহে সকলেরই প্রচুর ব্যয় হইয়া থাকে। বিবাহ সংক্রান্ত বহু আচার আছে। উহা নিষ্ঠাভাবে পালন করিতে হয়।

গ্রীক, জার্ম্মাণী ও ইহুদীদিগের বিবাহ বিধি জটিলতা পূর্ণ। নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবাহবিধির সঙ্গে জড়িত। ইহুদী ও খৃষ্টান সমাজে কন্যার পিতা বিবাহকালে প্রচুর যৌতুক দিতে বাধ্য।

এই দেশের মুসলমান সমাজে নারীদিগের সম্বন্ধে কয়েকটি বিধি নিষেধ আছে। বাঁদীর গর্ভজাতা কন্যা ব্যতীত, অপর কোনও মেয়ে, অনাত্মীয় কোন পরিবারে দাসীবৃত্তি করিবার অধিকারিণী নহে। কারণ, অনাত্মীয় কোনও পুরুষ কোনও নারীর মুখ দেখিতে পাইবে না, ইহাই বিধি। বাঁদী বা বাঁদীর গর্ভজাতা কন্যাদিগের বংশধারা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। পূর্ব্বে বাজারে হাটে বাঁদী কেনা বেচা চলিত। এখন সে ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। তবে গোপনে বাঁদী ক্রয় বিক্রয় বর্ত্তমান যুগেও চলিয়া থাকে। শ্বেতজাতীয়া বাঁদীর আমদানী এখনও প্রবলভাবে চলিতেছে।

ইহাদের গর্ভজাতা সন্তান সন্ততি হইতেই সার্কেসিয়ান, কুর্দ্দ ও জর্জ্জিয়ান জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। শ্বেতকায়া বাঁদীর আদর যত্ন পূর্ব্বে সমধিক ছিল তাহাদের আহার্য্য, বেশভূষা ছিল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। পারিবারিক প্রমোদোৎসবেও তাহারা সাদরে আমন্ত্রিত হইত। বাঁদীকে বিবাহ করিলে অগৌরব ঘটিত না। বর্ত্তমান যুগেও অগৌরব হয় না। রূপের আদর এদেশে চিরদিনই সমানভাবে চলিতেছে। বাঁদীর বিবাহে অর্থ ব্যয় অধিক হয় না। এজন্য অনেক পুরুষই বাঁদীকে বিবাহ করিতে চাহে। বিবাহের পর বাঁদীবধূর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

পুত্র যে সকল বাঁদীর অধিকারী, পিতা তাহাদের উপর কোনও অধিকার বিস্তার করিতে পারে না। বর্ত্তমানযুগে বহু বনিয়াদী অন্তঃপুরে খোজাভৃত্য কার্য্য করিয়া থাকে। পুরুষভৃত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার একেবারেই নাই।

এসিয়া মাইনরে রেশমের বাজারের বিশেষ খ্যাতি আছে। নারীরা গুটিপোকা পালনের কার্য্য করিয়া থাকে। সূতা বাহির করা, তাঁতে রেশমের বস্ত্র বয়ন করা নারীদিগের কার্য্য। বর্ত্তমানযুগে সেখানে অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। নারী শিল্পী নহিলে কোন কারখানার কাজই ভালরূপে চলিতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক কারখানায় নারী শিল্পী কাজ করিয়া থাকে।

স্মির্ণায় ফেজটুপীর প্রকাণ্ড বাজার আছে। সেখানকার নারীরা কলের সাহায্যে ফেজটুপী তৈয়ার করিয়া থাকে। কর্ম্মই এদেশের নারীর অনন্যসাধারণ গুণ। আলস্য পরায়ণতা এই অঞ্চলের নারীদিগের মধ্যে নাই বলিলেই চলে।

অপত্যহীনতার দুর্ভাগ্যকে সকল সম্প্রদায়ের লোকই চরম বলিয়া

মনে করিয়া থাকে। এজন্য পুত্র ও কন্যার আদর খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী সকল সমাজেই প্রচুর। পুত্রকন্যার মধ্যে আদর যত্নের পার্থক্য মোটেই নাই।

কুর্দ্দজাতি কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে। এজন্য কন্যার জন্ম হইলে তাহারা খুবই আনন্দলাভ করে। এক একটি কন্যা বিক্রয় করিয়া তাহারা প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া থাকে। সেজন্য কন্যার প্রতি যত্নও খুব বেশী।

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ৫ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সতর্ক দৃষ্টি সহকারে পালন করিতে হয়। ভূতযোনির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস আছে। এদেশবাসীর ধারণা ৫ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ের উপর ভূতের দৃষ্টি পড়িতে পারে। খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই কুসংস্কার সমভাবে বিদ্যমান।

গ্রীক নারী

আধুনিক গ্রীকজাতি বর্ণশঙ্কর। প্রাচীন গ্রীসের কথা এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। শ্লাভ, তুর্কী, আর্ম্মেনিয়ান্, ইহুদী, রোমান প্রভৃতি জাতি আসিয়া গ্রীসে বসবাস করার ফলে, আদিম জাতির সহিত শোণিত সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমান গ্রীক জাতি এই মিশ্র জাতির বংশধর। সংমিশ্রণের ফলে আচার রীতিতে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও, সকলে প্রাচীন গ্রীক আচার রীতিই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছে।

গ্রীস কৃষি প্রধান দেশ। নানাবিধ ফল সমগ্র গ্রীসে উৎপাদিত হয়। কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া পুরুষ ক্ষেত্রকর্ষণেই সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে। গ্রীক নারী অবশ্য ক্ষেত্রে হল কর্ষণ করে না, কিন্তু উৎপন্ন শস্যাদি গুদাম জাত করিয়া রাখে।

ইউরোপের প্রগতিপ্রবাহ, বিলাস, ব্যসন গ্রীসে বর্ত্তমান কালেও তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সভা সমিতি, নৃত্য আসর পার্টি প্রভৃতিতে বিলাসিনী সাজিয়া গ্রীক নারীরা এখনও অবসর যাপন করিতে শিখে নাই। সংসারে নারীই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ধনিগৃহে স্বহস্তে রন্ধন করিতে না হইলেও নারীরা উহার তদ্বির করিয়া থাকেন। প্রত্যহ প্রত্যেক গৃহের গৃহিণী কন্যা বধূকে সে কার্য্য করিতে হয়, নহিলে সমাজে নিন্দা অবশ্যম্ভাবী। গৃহকর্ম্মে গ্রীক নারীরা কোনও দিন উদাসীন নহে।

কৃষক পরিবারের নারীরা ছাগলের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে

অবিবাহিতা কৃষক কিশোরী মেষ ও ছাগপাল চরাইয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরে। বাড়ীর গৃহিণী ছাগ মেষগুলিকে খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া রাখে। মেষের লোম ছাঁটিয়া, নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত করা, পিঁজিয়া পশম বাহির করার কাজ নারীরাই করিয়া থাকে। আবহমানকাল হইতে কৃষকনারীরা এই কাজ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান প্রগতিযুগেও তাহা অব্যাহত আছে। যে কন্যা বয়নকার্য্য জানে না, তাহার পক্ষে সুপাত্র মিলা কঠিন। যুবতী বা কিশোরী কন্যারা গৃহবাতায়নে বা গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সূতা কাটার কাজ করিতেছে এবং পথের লোকজন দেখিতেছে, এ দৃশ্য সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গ্রীসে প্রচুর রেশম কীট উৎপাদিত হয়। গৃহে গৃহে রেশম কীট প্রতিপালিত হইয়া থাকে। রেশমের সূতা বাহির করা এবং সেই সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের কাজ নারীরাই করিয়া থাকে। রেশমের কাজে গ্রীকনারীর পটুতা অসামান্য।

গ্রীসের নারীরা নানা বিচিত্র বর্ণের বেশভূষার পক্ষপাতী। কোনও গ্রীক নারী সাদা পোষাকে পথে বাহির হয় না। পোষাকের ছাঁদে প্রাচীন গ্রীক রীতির আদর্শ দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রীসের নারীরা সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধা। পোষাকের বৈচিত্র্যে তাহাদিগকে মনোহারিণী মনে হইবে।

গ্রীক নারীর রূপের তুলনায় গুণও প্রচুর। দয়া মায়া মমতায় গ্রীক নারী অগ্রগণ্যা। কর্ত্তব্য কর্ম্মেও উপেক্ষা নাই। গ্রীক নারীর কাছে সতীত্বের মর্য্যাদা সমধিক। বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু যে নারী বিবাহ বন্ধনবিচ্যুতা, সমাজে তাহার কোনও মর্য্যাদা থাকে না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্রী মনে করিয়া থাকে। এজন্য কদাচিৎ গ্রীক নারী বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া থাকে।

গ্রীক জাতি অত্যন্ত অতিথিবৎসল। পুরুষ ও নারী সমভাবেই অতিথির পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। অতিথির প্রতি গ্রীক জাতির বিশ্বাস অত্যন্ত অধিক। গৃহে কোনও অতিথিসমাগম হইলে, বাড়ীর মেয়েরা তাহার সমগ্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। গৃহে পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে কি না, সংসার কিভাবে চলে, অর্থাভাব আছে কিনা, জীবনে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছে কি না, এ সকল প্রশ্ন দরদ দিয়া জিজ্ঞাসা করে। অল্পক্ষণেই অতিথি যেন পরমাত্মীয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রীক জাতির পারিবারিক জীবন সাধারণতঃ সুখের। দিনের কাজ সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিবার পর সকলে মিলিয়া নানা গল্প গুজব, গীতবাদ্য ক্রীড়া ও অন্যবিধ আমোদ প্রমোদে পারিবারিক জীবনে যেন স্বর্গ রচিত হয়। অতি প্রাচীন যুগের এই প্রথা এখনও চলিতেছে। সন্ধ্যার মিলন আসরে নৃত্যগীতের সঙ্গে গল্প বলার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। নারীদিগের গল্প বলিবার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরাই গল্প বলিয়া থাকে। অন্য সকলে পরম আগ্রহে গল্প শ্রবণ করে।

উৎসব উপলক্ষে বা আনন্দ মেলায় এখনও প্রাচীন যুগের গ্রীক নৃত্য ও গীতি রীতি প্রচলিত। পুরুষ ও নারী একত্র মিলিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। গ্রীকদিগের মধ্যে শিক্ষিত সমাজে বিলাতী বল নৃত্য প্রথা ইদানীং প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনত্বের প্রতি গ্রীকজাতির এমনই গৌরব বোধ যে, বড় বড় নৃত্যের আসরে পূর্ব্বে গ্রীক প্রথায় নৃত্য গীতের পর তবে বল নৃত্যের অভিনয় হইয়া থাকে। গৃহস্থ বা দরিদ্র পরিবারে এখনও বলনৃত্য প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই।

গ্রীকজাতির প্রাণে আবেগবিহ্বলতা অধিক। কবিত্বের মাধুর্য্য

গ্রীক্ নরনারীর প্রাণে সহজে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবেগ বিহ্বলতায় তাহারা দুঃখ কষ্ট সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হইয়া থাকে।

গ্রীক নারীর মনে কুণ্ঠা ও সলজ্জভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। নারীজন্ম গ্রীসে ধিক্কৃত নহে। নারীর সমাদর করিতে গ্রীক পুরুষ জানে এবং করিয়া থাকে। পুরুষ ও নারী সমান, এ ভাবধারা এখনও গ্রীক নারীকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে নাই। কোনও গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে, পুত্রের ন্যায় সমাদরে তাহাকে অভার্থনা করা হইয়া থাকে। জন্মদিন বা জন্মতিথি উপলক্ষে পুত্র কন্যার জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—কোনও পার্থক্য তাহাতে দেখা যায় না।

গ্রীসের বিবাহ প্রথায় বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বিবাহানুষ্ঠান গির্জ্জা বা ধর্ম্মমন্দিরে সম্পন্ন হয়, কিন্তু গ্রীসের বিবাহ কার্য্য গৃহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোনও পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহের কথা পাকাভাবে স্থির হইলে, বিবাহের নির্দ্দিষ্ট তারিখের কয়েক দিন পূর্ব্বে কন্যাকে স্বামিগৃহে যাইতে হয়। কয়েক দিন কন্যা তথায় বাস করিয়া থাকে। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সেই সময় কন্যাকে নানাবিধ দ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই এই সময়ে উপহৃত হইয়া থাকে। কন্যা উপহৃত দ্রব্যাদি স্বামিগৃহে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে।

তখন কন্যা পিতামাতার নিকট বলে যে, সে বিবাহ করিবে না। প্রথা এই যে, মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন কন্যাকে বুঝাইতে থাকেন, বিবাহ না করিলে জীবনধারণ মিথ্যা। নারী জন্ম বিবাহ ব্যতিরেকে সার্থক হইতে পারে না। কন্যা কিন্তু তথাপি সম্মত হইতে চাহে না। এইভাবে চলিতে থাকে। তারপর নির্দ্দিষ্ট বিবাহ দিনে বর

সদলবলে কন্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বলপূর্ব্বক কন্যাকে লইয়া বর নিজ গৃহে চলিয়া যায়।

এই দ্বিতীয়বার আগমনের পর কন্যাকে স্বামিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দেখা শুনা করিতে হয়। বধূ নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে, স্বহস্তে আহার্য্য পরিবেষণ করে। আহারান্তে আত্মীয় স্বজন যে যাহার গৃহে চলিয়া যায়। বধূ তখন স্বামিগৃহে অচলভাবে আসন পাতিয়া বসে।

গ্রীসে যখন তুরস্ক প্রভাব প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় গ্রীক নারীরা স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা ব্যতীত, অপর পুরুষের সহিত কথা কহিতে পাইত না। ইদানীং সে ব্যবস্থা নাই। এখন গ্রীক নারী যে কোনও পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। তাহাতে সামাজিক শাসন নাই। তবে পরপুরুষের গাত্রলগ্ন হইয়া বসা বা দাঁড়ান কিংবা খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা বলা নিষিদ্ধ। পল্লী-সমাজে এ ব্যবস্থা নিষ্ঠা সহকারে প্রতিপালিত হয়। তবে শিক্ষিত সমাজে ইহার অনেকটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

গ্রীসে অবরোধ নাই। গ্রীকনারীরা যে কোনও পেশা জীবিকার জন্য গ্রহণ করিতে পারে। সে সম্বন্ধে তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা আছে। নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধেও কোনও নিষেধের বালাই নাই। গ্রীসদেশে নারী ব্যবহারাজীবের সংখ্যা অল্প নহে। আদালতে নারী আইন ব্যবসায়ী ভিড় করিয়া আছে।

আধুনিক গ্রীক জাতির ধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক। কিন্তু পৌরাণিক যুগের দেবদেবী, ঐতিহাসিক ক্ষণজন্মা নবনারীর পূজায় গ্রীকজাতি এখনও পরম আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাচীনত্বের তাহারা ভক্ত। এই সকল উৎসবে পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

গ্রীসে কলকারখানা সংখ্যায় অল্প। তাহাতে নরনারী কাজ করে বটে,

কিন্তু সেজন্য গ্রীক নরনারীর মনে আনন্দপ্রবণতা হ্রাস পায় নাই। গ্রীসে যখন পর্ব্ব উপলক্ষে উৎসব হয়, তখন দলে দলে নরনারী সমুদ্র উপকূলে সমবেত হয়। নৃত্যগীত কয়েক দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষেই উৎসবের ঘটা অধিক হইয়া থাকে।

গ্রীক নরনারী সৌন্দর্য্য চর্চ্চায় বিন্দুমাত্র উদাসীন নহে। গ্রীক নারী ব্যায়াম সমন্বিত নৃত্যের দ্বারা শরীরকে সুঠাম ও সুগঠিত করিয়া তুলে। কেশ বিন্যাসের বিভিন্ন কৌশল গ্রীক নারী শিক্ষা করিয়া থাকে। গ্রীসীয় নারীর বর্ণরাগ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের নারীর বর্ণরাগ অপেক্ষা বিভিন্ন এবং মধুর। পরিচ্ছন্নতার জন্য গ্রীকনারী প্রসিদ্ধ। দরিদ্র কুটীরেও বিন্দুবাত্র অপরিচ্ছন্নতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সকলেই পরিচ্ছন্নভাবে থাকে। পোষাক পরিচ্ছদ ধূলি কণিকা বর্জ্জিত।

নারীদিগের ধর্ম্ম নিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল। বাৎসল্য রসের দ্বারা ধর্ম্ম নিষ্ঠা অভিষিক্ত হইয়া তাহা অতি মধুরভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পূজা বা পর্ব্বোপলক্ষে গ্রীক্‌নারী স্বামী, পুত্র প্রভৃতির কল্যাণ কামনা করিয়া মন্দিরে মন্দিরে দেবতার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকে—তীর্থ সলিলে স্নান করিয়া জপতপ প্রভৃতিও নিষ্ঠাভরে করিয়া থাকে

গ্রীক নারীর লজ্জাশীলতা আছে। আলোক চিত্র তুলাইবার সময়ও তাহারা সাধারণতঃ কুণ্ঠা ও লজ্জা প্রকাশ করিয়া থাকে। শিক্ষিত গ্রীক সমাজেও এইরূপ লজ্জার অনেক দৃষ্টান্ত এখনও পাওয়া যায়। গৃহস্থ পল্লী পরিবারেও এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর।

প্রসাধন ও স্নানের দিকে গ্রীক নারীর আগ্রহ সমধিক। প্রত্যহ স্নান করা তাহাদিগের অভ্যাস। গ্রীসের যে সকল অঞ্চলে জল কষ্ট, সেখানকার নারীরাও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া জল সংগ্রহ করে—স্নান করিবার জন্য।

গ্রীকনারীর জীবনে সাধারণতঃ জটিলতা দেখা যায় না। সরল সচ্ছন্দ

জীবন যাত্রায় তাহারা অভ্যস্ত। এজন্য মনের সন্তোষ তাহাদিগের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায়। বর্ত্তমানযুগে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি নারী তাহার কেন্দ্রচ্যুত হয় নাই। উচ্চ শিক্ষিতা গ্রীক মহিলারাও প্রাচীন আদর্শের পক্ষপাতিনী। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা শুনিলে ভদ্র ও শিক্ষিত গৃহের মহিলারা এখনও শিহরিয়া উঠেন।

পারস্য নারী

পারস্যদেশে নারী অনাদৃতা। কোনও গৃহে কন্যা জন্মিলে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে। মেয়ের জন্য সূতি পোষাক ও সাধারণ দোল্না প্রসূতির ঘরে রাখা হয়। পিতার কাছে কন্যা সাধারণতঃ অনাদৃতা।

বর্ত্তমানযুগে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া কন্যা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়; কিন্তু উহা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত আর কিছু নহে। পারস্যদেশে যে কন্যা লেখা পড়া ভাল জানে, সে লোকের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠে।

অন্তঃপুর সম্বন্ধে পারস্যবাসীরা অত্যন্ত সচেতন। নারী বাহিরের আলোক দর্শন করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। বাহিরের কোনও অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পায় না।

লেখা পড়া কন্যাকে ভাল করিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু সেলাই ও বুননের কার্য্য তাহাকে ভাল করিয়াই শিখিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই মেয়েরা অন্তঃপুরে থাকিতে অভ্যস্ত—বাহিরে আসিবার প্রথা নাই। নিমন্ত্রণ ব্যাপারে মাতার সহিত কন্যার যাইবার ব্যবস্থা আছে বটে।

ধনী পরিবারের নারীরা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হন—সর্ব্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা থাকে। সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীর দল। দরিদ্র নারীরা গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া যায়।

হামাম বা স্নানাগারে পারস্য নারীরা সমবেত হইয়া থাকেন। সেখানে আত্মীয়া বান্ধবী প্রভৃতির সহিত দেখা হয়—আলোচনা চলে। হামামে আসিয়া সমস্ত দিন সেখানে যাপিত হয়। আহারাদি সবই সেখানে হয়। স্নানাগারে আসিবার সময় বসন ভূষণ এবং আসন প্রভৃতি সঙ্গে আসে। স্নান ব্যাপার একটা পর্ব্বের মত। সেজন্য সেখানে পারস্য নারীরা গমন করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন।

গৃহে পারস্য নারীরা হাঁটু পর্য্যন্ত পায়জামা আঁটিয়া পরিধান করেন। গায়ে মখমল কিংবা রঙ্গীন কাপড়ের জ্যাকেট, পায় সাদা মোজা। মাথায় সাদা মসলিনের চৌকা ব্যাণ্ড। বাহিরে যাইবার সময় ধনিঘরণী বা দুলালীরা আপাদ মস্তক বোরখায় আবৃত করেন। আনন জালের দ্বারা আবৃত থাকে। চরণ যুগলে গোড়ালীহীন চটিজুতা ব্যবহার করেন। পথে যদি দৈবাৎ কেহ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

পারস্যদেশে কন্যার একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দশবৎসর বয়স হইতে পাত্রানুসন্ধান চলে। বিবাহ ব্যাপারে কেহ কন্যার মতামতের কোনও অপেক্ষা রাখে না। পিতা যাহাকে কন্যাদান করিবেন, সেইখানেই কন্যাকে যাইতে হইবে। অধুনা বিবাহের বয়স কিছু বাড়িয়াছে। ১৪।১৫ বৎসরেই বিবাহ দিতে হয়। অবশ্য তরুণী কন্যার মতামত গ্রহণীয় নহে। অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া সাধারণতঃ যখন মেয়েদের সহিত পুরুষের দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, তখন পূর্ব্বরাগ অসম্ভব। যৌন সম্পর্কের সম্ভাবনাও বিরল।

কন্যার বিবাহের পাত্র স্থির হইলে, পাত্রের মাতা ভগিনী বা নিকট আত্মীয়ারা কন্যা দেখিতে গমন করেন। পাত্রী পছন্দ হইলে পাত্রের গৃহে পাত্রীর এবং তাহার জননীর চায়ের নিমন্ত্রণ হয়। কিন্তু পাত্রকে

ডাকিয়া মেয়ে দেখাইবার প্রথা নাই। পাত্রী আপাদ মস্তক বোরখায় আবৃত করিয়া আসে। কিন্তু তথাপি পাত্রের মাতা ভগিনী প্রভৃতি গোপনে পাত্রকে পাত্রী দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এই গোপন ব্যবস্থা সকলেরই বিদিত। তথাপি ব্যবস্থার ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই।

পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনের পর মৌলবীর সম্মুখে বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি ভাবে স্থির হয়। বর যদি কন্যাকে পছন্দ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেজন্য সমাজে পাত্রের নিন্দার সীমা থাকে না।

এই বাক্‌দান বা পাকা দেখার সময় কন্যাকে সুসজ্জিত বেশে ঘরে বসাইয়া রাখা হয়। তখন তাহার অঙ্গে একখানি সবুজবর্ণের আচ্ছাদন থাকে। মৌলবী একখানি বড় পিত্তল পাত্রে প্রজ্বলিত প্রদীপ রাখিয়া পাত্রটি উপুড় করিয়া দেয়। পাত্রের উপর একখানি বস্ত্র ও বালিস রাখিয়া শয্যা রচিত হয়। কন্যা তদুপরি উপবেশন করে। এই আসনের অর্থ, বিবাহ হইলে কন্যা স্বামিগৃহে কর্ত্রীর আসন পাতিবে। সে আসন তাহার অম্লান যশোভাতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরদিন বিরাজিত থাকিবে। বিবাহের সময় উক্ত সবুজ আবরণখানি বধূর অঙ্গবাসরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বামিগৃহে গমনকালে বধূ রুটী বা পরোটা এবং কিঞ্চিৎ লবণ সঙ্গে লইয়া যায়। ইহার অর্থ স্বামিগৃহ ধনধান্য ও সৌভাগ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। বিদায় গ্রহণকালে কন্যা পিতৃগৃহের রন্ধন চুল্লীকে চুম্বন করিয়া যায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা পারস্যদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু দেশাচার এমন প্রবল যে, স্বামী অত্যাচারী হইলেও বধূর মুক্তিলাভের কোন পথ নাই। বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছাই প্রবল এবং অমোঘ। স্বামী ইচ্ছা করিলেই পত্নীকে তালাক দিয়া নিজে মুক্তিলাভ করিতে পারে,

কিন্তু পত্নীর পক্ষে উহা সহজসাধ্য নহে। তবে কন্যার পিতা বা আত্মীয় স্বজন ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী হইলে বধূ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার সুযোগ পায়।

পুরুষের এককালে চারিটি পত্নী গ্রহণ কবিবার ব্যবস্থা আছে। ,এজন্য স্ত্রীকে সকল সময়েই সতর্কভাবে চলিতে হয়। পাছে স্বামী খেয়ালবশে সপত্নীর দ্বারা তাহার সুখের পথের কণ্টক রোপণ করেন। পারস্যদেশীয় পুরুষ স্ত্রীর প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই অত্যাচার করিয়া থাকে। স্বামীর ইচ্ছানুসারে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রেমময়ী পত্নী কর্ত্রীর আসনচ্যুত হইয়া হীনতমা বাঁদীর পর্য্যায়ে পড়িতে পারে। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই।

পারস্যের নারীর অন্তর স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ। সন্তান লাভ তাঁহাদের জীবনের অন্যতম প্রধান কামনা। যথাসময়ে সন্তান জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহারা তীর্থপর্য্যটন, পয়গম্বরের পূজা প্রভৃতি দিয়া অভীষ্টফল লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

পারস্যের বহু জ্ঞানী পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, নারীর বচনে পুরুষের বিভ্রমোৎপাদন যেন না হয়। নারীর অপাঙ্গ দৃষ্টি হইতে পুরুষকে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শত উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নারীর পরামর্শ গ্রহণ অকর্ত্তব্য। নারীজাতির আত্মা আছে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। পারস্যের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশে নাকি নারীর জন্য কোনও স্বর্গের ব্যবস্থা নাই। তবে যদি সমস্ত জীবন ধরিয়া নারী তীর্থ ভ্রমণ করে তাহা হইলে স্বর্গের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রান্তে তাহারা প্রবেশাধিকার পাইতে পারে

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই কঠোরতার হ্রাস বর্ত্তমানে অনেকটা হইয়াছে। কালে হয়ত আরও হইতে পারে। পারস্য নারী ভূষণপ্রিয়া।

আতিথ্যপরায়ণতাও তাঁহাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মেয়ে মজলিসের নিত্য ব্যবস্থা পারস্যে আছে। এ সকল মজলিসে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই।

মজলিসে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা থাকে। পাশ্চাত্য নৃত্য পারস্য মহিলাসমাজে অনুকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে ওয়াল্জ নৃত্য পারস্য নারী সমাজে বিশেষ সমাদৃত। সঙ্গীত চর্চ্চা প্রত্যেক গৃহেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। তারের যন্ত্র পারস্য নারী সমাজে সমধিক প্রচলিত।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব সত্ত্বেও পারস্য নারীর মন হইতে ভূতের ভয় এখনও যায় নাই। পারস্য নারীর বৈশিষ্ট্য—সংসারে স্বামী ও পুত্রের জন্য মমতা, দরদ, মৃত্যুর পর স্বর্গ কামনা এখনও পারস্য নারীর মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রগতিবাদ এখনও তাহা পারস্য নারীর মন হইতে উৎপাটিত করিতে পারে নাই। তাঁহাদের মনে এখনও আদিম যুগের নারীত্ব বিরাজিত।

মিশর সুন্দরী

মিশর বলিতে লোহিত সমুদ্রের উপকূলভাগ হইতে সাহারা মরুভূমি এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিউবিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীলনদের তীরবর্ত্তী ১২ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী ভূখণ্ড ব্যতীত বাকি সবই মরুভূমি।

মিশর বহু প্রাচীন দেশ। ৬ হাজার বৎসর ধরিয়া বহু জাতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ মিশরে আপতিত হইয়াছে, বসবাস করিয়াছে। মিশরে দেশীয় কৃষক (ফেলাইন) ব্যতীত, কপ্‌ট আরব, গ্রীক, সিরীয়, তুর্ক, পারসী ও য়ুরোপীয়গণের বাস। মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

মিশর অধুনা অনেকটা স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি হইলেও এখনও তত্রত্য নরনারীর এক নবমাংশ মাত্র শিক্ষিত। অবশ্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের ফলে শিক্ষার প্রসার মিশরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতেই মিশর স্বাধীনতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

নীলনদের তীরবর্ত্তী স্থানের নরনারীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত বলিয়া তাহাদের দৈহিক গঠন ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার। ইহারা আরবদিগের বংশধর। নারীরা সাধারণতঃ অপূর্ব্ব সুন্দরী। ফেল্লারা কৃষিজীবী এবং মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। ইহাদের মধ্যে প্রগতির চিহ্ন দুর্ল্লভ। ইহাদের ধর্ম্ম মুসলমান, ভাষাও আরবী।

মিশরীয়দিগের জীবনযাত্রার প্রণালীতে আরবদিগের প্রভাব সুস্পষ্ট। ধর্ম্মশাস্ত্রে একাধিক বিবাহের আদেশ থাকিলেও ফেল্লারা একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। ফেল্লারা অত্যন্ত রক্ষণশীল। পুরাতন আচার ব্যবহার রীতি নীতির পরিবর্ত্তনে তাহারা সম্মত নহে। এজন্য নারীরাও প্রাচীন পন্থারই উপাসিকা।

মিশরীয়দিগের মধ্যে আর্ম্মাণী, সিরীয় এবং কপ্‌টরাই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। নামে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহাদের আচার ব্যবহার ভাষা ভাব মুসলমানের প্রভাব বিশিষ্ট। খৃষ্টান কপ্‌টনারীরা শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী। তাহাদিগের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতিও মুসলমানদিগের অনুরূপ। মুসলমানরা মসজেদে নমাজ পড়িয়া থাকে, কপ্‌টরা ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করে। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও পার্থক্য ইহাদের মধ্যে নাই।

অধুনা নবযুগের আবির্ভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে মিশরীয়দিগের অনেকে অগ্রসর হইতেছেন। মিশরীয় নারীরাও রাজনীতিক্ষেত্রে পুরোবর্ত্তিনী হইতেছেন। স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ইহারা মিশরের মানচিত্রকে নূতন করিয়া অঙ্কিত করিতে চলিয়াছেন। স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদিগের সহিত একযোগে আবেদন নিবেদনেও নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

মিশরের রাজধানী কায়রো এখন অগ্রগতির পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। মুসলমান নারীরা অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিলেও বাহিরের আলোকে আসিতে এখন আর পশ্চাৎপদ নহেন। ইঁহারা সাধারণতঃ নয়ন যুগল অনাবৃত করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন জাতির সমাবেশ মিশরে আছে বলিয়া, যে যাহার ধর্ম্মমত ও আচার ব্যবহার অনুসারে চলিয়া থাকে। কিন্তু ইদানীং মিশরীয়রা পূর্ব্বতন সংস্কার বহুলাংশে পরিহার করিয়া অগ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া

চলিবার চেষ্টা করিতেছে। তবে সহরের ভাব এখনও পল্লীতে অনুভূত হয় নাই। পল্লীগুলি এখনও প্রাচীন রীতি নীতি আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বিবাহ ব্যবস্থা স্বস্ব ধর্ম্মের অনুসরণে ঘটিয়া থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রগতিবাদ এখনও বিবাহ বিচ্ছেদকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিতে পারে নাই। মিশরের বহুনারী আধুনিকভাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন। অবশ্য সম্ভ্রান্ত ঘরেই শিক্ষার প্রসার সমধিক। কপ্‌টদিগের মধ্যেই শিক্ষার প্রচলন অধিক।

সুদানও মিশরের অন্তর্গত। উত্তরাঞ্চলে মিশ্র আরব জাতির বাস। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এখানে কৃতদাস প্রথার উচ্ছেদ বহুল পরিমাণে হইলেও, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সুদানের পুরুষরা অপরিচিতা নারীর প্রতি বিশেষ লুব্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন।

প্রকৃত আরব নরনারী সুদানের উত্তরাংশে বসবাস করিয়া থাকে। এই প্রদেশের সকলেই আরবী ভাষা গ্রহণ না করিলেও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

মিশরীয় বালকবালিকারা অল্প বয়স হইতেই ইদানীং বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে যায়। বড় বড় সহরেই এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পল্লীগ্রামের নারীরা এখনও নিদ্রাতুরা। তবে মিশর যে ভাবে আত্মসংগঠনে মন দিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই শিক্ষাদীক্ষায় মিশরীয়গণ নরনারী নির্ব্বিশেষে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

মিশরীয় নারীদিগের বিবাহের বয়স ইদানীং নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কোনও নারীই বিবাহিতা হইতে পারিবে না। বাধ্যতামূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। নারী জাগরণের ফলে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি বড় বড় সহরে অবগুণ্ঠন বহুল পরিমাণে কমিয়া

গিয়াছে। অবরোধের কড়াকড়িও তেমন নাই। এখন মুসলমান নারীরা স্বামী ও পুত্রের সহিত রাজপথে প্রকাশ্যে বাহির হইয়া থাকেন। শত শত নারী স্বয়ং জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন।

মিশরীয় সরকার উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন নারীকে ইউরোপে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহারা মিশরের নারীজাতিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। হিসাব অনুসারে দেখা যায়, মিশরীয় নারীদিগের মধ্যে শতকরা দুইজনের অধিক শিক্ষিতা নহেন। নবোদ্যমে চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে নারীরা আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

জাপানী-কুসুম

প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক এবং ঔপন্যাসিক পীয়ের লোটী জাপানী সুন্দরী দিগকে চন্দ্রমল্লিকা ফুলের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। অবশ্য তখন বিংশশতাব্দীর বর্ত্তমান প্রগতিযুগ আরম্ভ হয় নাই। জাপান এখন বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেও, জাপানী নারী এখন প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে।

শিক্ষায় এ যুগে জাপানী নারী বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে সত্য। আধুনিক পাশ্চাত্য জীবন ধারার সহিত পরিচয় জাপানী নারীর সামান্য নহে কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানে নারীর কোন স্বাধীন সত্তা নাই। ইহা সাধারণ ভাবে সত্য। তবে যাহারা ইদানীং ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাইতেছে, সেই সকল তরুণী লেখাপড়া শিখিয়া জাপানে ফিরিয়া আসিবার পর এরূপ বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না।

পিতামাতা তাঁহাদের মনোনীত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, ইহা জাপানের সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিতা কোনও কোনও জাপানী নারী এরূপ ব্যবস্থায় ইদানীং সম্মত হইতে চাহিতেছে না। এমনও দুই একটা ঘটনার কথা সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, আমেরিকা হইতে বিদ্যার্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে জাপানী তরুণী জাহাজে সংবাদ পাইল যে, তাহার পিতামাতা পাত্র স্থির করিয়া তাহার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিয়াছেন। আমেরিকার শিক্ষায় তখন জাপানী

তরুণীর মনে প্রাণে নূতন ভাবধারার বন্যাপ্রবাহ চলিয়াছে। সে পিতা মাতাকে জাহাজ হইতেই পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিল, যাহাকে কখনও দেখে নাই, যাহার সহিত কখনও আলাপ পরিচয় নাই, তাহাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না। অথচ পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের অবাধ্য না হওয়া। সুতরাং এখন উভয় সঙ্কট হইতে মুক্তি-লাভের উপায় মৃত্যু। জাহাজ হইতে পত্র লিখিয়া উল্লিখিত জাহাজ ইয়োকোহামা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তরুণীটি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করে।

জাপানের নারীরা পিতামাতার প্রতি কদাচ অবাধ্য হয় না। বিবাহিত জীবনে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, তাহাদের স্বভাব-ধর্ম্ম। জাপানী নারীরা ধর্ম্মবিশ্বাসবতী। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানের প্রচলিত ধর্ম্ম। প্রত্যেক জাপানী নারী একান্ত বিশ্বাসে ধর্ম্ম পালন করিয়া চলে। স্বদেশ প্রেম তাহাদের অস্থি-মজ্জাগত।

স্ত্রী পুরুষে বন্ধুত্ব জাপানের স্বাভাবিক অবস্থা না হইলেও, ইদানীং বড় বড় সহরে স্ত্রী পুরুষের সখ্য বিরল দৃশ্য নহে। টোকিও সহরে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত নাচের আসর পূর্ণোৎসাহে চলিতে থাকে। জাজ-নৃত্য ও বাদ্য সেই নৃত্য মজলিসের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু জাপানীরা এরূপ ব্যাপারের ঘোর বিরোধী। তাহারা এইরূপ ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। একবার কিছুদিন পূর্ব্বে টোকিওর কোনও হোটেলে কয়েকজন প্রগতি বাদিনী জাপানী নারী ও প্রগতিশীল পুরুষ নৃত্যগীত করিতেছিল। একদল জাপানী ছাত্র হোটেলে প্রবেশ করিয়া নৃত্যরত নারী ও পুরুষদিগকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দেয়। তাহারা ঐ সকল তরুণ তরুণীকে বলে যে, তাহারা দেশের কুলাঙ্গার। কিন্তু যে সকল বিদেশী সেই আসরে ছিলেন, তাহাদিগকে যুবক ছাত্রদল কোন কথাই বলে নাই।

টোকিও সহরে প্রতীচ্য রীতিতে হোটেল, চায়ের দোকান প্রভৃতির সংখ্যা নাই। কিন্তু কোনও জাপানী তরুণ তরুণীকে এ সকল স্থানে একত্র বসিয়া আমোদ প্রমোদ ও পানাহার করিতে কদাপি দেখা যাইবে না। তাহারা এসকল ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহে। উহা অনাচার বলিয়া জাপানী সমাজে নিন্দিত। জাপানে অবাধ প্রেমচর্চ্চা আদৌ নাই। চুম্বন রীতি জাপানের সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ। নারী জাপানে পবিত্র ও সংযত জীবনযাত্রার পথে চলিয়া থাকে। গৃহধর্ম্মের প্রতি নারীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সন্তান পালন এবং গৃহধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থায় জাপানী নারী সুগৃহিণী।

বাহিরের জীবনযাত্রায় জাপান ইউরোপীয় রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করিলেও, গৃহে তাহাদের সে বিলাস নাই। জাপানী নারীরা তাহাদের কিমানো ব্যবহারেই সন্তুষ্ট থাকে। জাপানী নারীর জঙ্ঘা আবরণ মুক্ত থাকিলে নিন্দার কথা নহে। কিন্তু স্কন্ধের পশ্চাৎ দিক আবরণ মুক্ত থাকিলে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়।

ইদানীং জাপানে কারখানার সংখ্যা ৮৫ হাজার। স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিক সেই সকল কারখানায় কাজ করে। কিন্তু তাহারা যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাহা বিস্ময়কর। জাপানী নারী শ্রমিকরা পুরুষদিগের ন্যায়ই নিষ্ঠাভরে কার্য্য করিয়া থাকে।

রাজভক্তি জাপানী নারীদিগের মধ্যেও প্রবল। ইহারা রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। রাজার জন্য প্রাণদান শুধু পুরুষের নহে, জাপানী নারীদিগেরও কাম্য।

জাপানে গেইশা নারীরা স্কুলে লেখাপড়া, নৃত্যগীত শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের আচরণ যেমন ভদ্র, তেমনই বিনয়-নম্র। জাপানী নারীর বিনয় নম্র ব্যবহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয় প্রভাব জাপানে প্রবল হইলেও জাপানী নারীরা প্রতীচ্য প্রভাবে আত্মহত্যা করে নাই

তাহারা স্বদেশের, স্বজাতির বৈশিষ্ট্য, আচার ব্যবহার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

জাপানী নারীরা পুরুষদিগের ন্যায়ই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন। স্বাস্থ্য-রক্ষা যে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য একথা কোনও জাপানী নারীকে শিখাইতে হয় না। জাপানে লেখাপড়া না জানা মেয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সকলেরই লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ সমধিক। ললিত কলাবিজ্ঞানের দিকেও জাপানী নারীর আগ্রহ অল্প নহে। নৃত্যগীত প্রভৃতি ললিতকলায় সহর ও গ্রামের নারীরা প্রচুর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে।

জাপানে সামরিক প্রথার প্রচুর সমাদর বলিয়া, নারীরাও সামরিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। সন্তান, স্বামী, পিতা, ভ্রাতা বীর নামে পরিচিত হইবে, ইহা প্রত্যেক জাপানী নারীর কাম্য।

অতিথিপরায়ণতা-ও জাপানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জাপানী নারীরা অতিথির সমাদর করিতে জানে। অতিথির সম্ভ্রম রক্ষায় পুরুষের ন্যায় নারীও উদাসীন নহে।

বিবাহ সম্বন্ধে জাপান ও চীনের নিয়ম অনেকটা একই প্রকার। পিতামাতা বা অভিভাবকরাই পুত্রের জন্য কন্যা, বা কন্যার জন্য পাত্র মনোনীত করিয়া থাকেন। বিবাহ পদ্ধতি অনেকটা প্রাচ্য ধরণের। ধর্ম্মের সহিত বিবাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহা জাপানীরা খুব ভাল করিয়াই বুঝে। এজন্য ব্যভিচার সেখানে নিন্দিত।

বিবাহ বিচ্ছেদ জাপানে অপ্রচলিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্বামিপরায়ণা নারী বিবাহ বিচ্ছেদ চাহে না।

জাপানী নারীর সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার নাই। মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ জাপানী নারীর অধিকার বহির্ভূত। নারী সম্বন্ধে জাপান এমন কৃপণ হইলেও, সে সম্বন্ধে অসন্তোষের অভিযোগ কদাচিৎ

শুনিতে পাওয়া যায়। জাপানী নারীরা ত্যাগশীলা। ত্যাগধর্ম্মের শিক্ষা তাহারা শৈশবকাল হইতেই অনুশীলন করিতে শিখে।

অবশ্য হাওয়ার পরিবর্ত্তনে, প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীদিগের মনে ইদানীং ক্ষোভের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কোন কোন ক্ষেত্রে শুনিতে পাওয়া গেলেও, সাধারণভাবে প্রতিবাদ প্রবল হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নারীর কোনও বিষয়ে স্বত্বাধিকার না থাকিলেও, জাপানী পুরুষ নারীকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না। বরং শ্রদ্ধার অঞ্জলিই তাহাকে দিয়া থাকে। জাপানী নারীরা নিজেদের অবস্থায় আদৌ অসন্তুষ্ট নহে। এ সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞব্যক্তির মন্তব্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন নাই।

চীন-ললনা

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত সত্য, কিন্তু কনফ্যুসিয়সের শাস্ত্রীয় বিধান সে দেশে অত্যন্ত প্রবল। এই ধর্ম্ম শাস্ত্রবেত্তা নারী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না। নারীকে প্রশ্রয় দিলে তাহারা মাথায় চড়িয়া বসে, ইহাই ছিল তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা। চীনের এই অন্ধ সংস্কার দূর করিবার জন্য মহামতি সান ইয়াৎসেন তিনটি বিশেষ বিধি চীনা জাতির জন্য প্রণয়ন করেন। এই বিধিত্রয় স্কুল সমূহে বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিধির অন্তর্গত। এই সময় হইতেই চীনে নারী জাগরণের সূত্রপাত।

চীনদেশে এখন শিক্ষয়িত্রী, ম্যাজিষ্ট্রেট, ট্রেডইউনিয়ন সেবিকা, প্রচারিকা, সেক্রেটারী, ডাক্তার, অভিনেত্রী অনেক দেখিতে পাওয়া যাইবে। চীনা নারীরা অধুনা অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে দেশে বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকেন। বিদেশে গিয়াও নারীরা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও নারী এখন পশ্চাতে পড়িয়া নাই।

চীনের ঐতিহ্য—"নারীর প্রকৃত ক্ষেত্র গৃহ। চীনের মহান নীতি গ্রন্থ চতুষ্টয়ের একখানিতে বলা হইয়াছে, "একটা পরিবারের প্রীতির দৃষ্টান্তে সমগ্র রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর এবং পারিবারিক সৌজন্য বৃহৎ একটা দেশকেও সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।"

চীনের সমাজ জীবনে বর্ত্তমান যুগেও মাতার প্রভাব অসামান্য। বর্ত্তমান যুগেও চীনা সন্তান নবচান্দ্র বৎসরান্তে (Lunar New year)

বা মাতার জন্মদিনে নতজানু হইয়া মাতাকে সম্মান জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

নৈতিক ধর্ম্মের ভিত্তির উপরেই চীনের শিক্ষাবিধি প্রতিষ্ঠিত। ২ হাজার ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে চীনের অন্যতম জ্ঞানী, গুরু মেনসিয়সের জননী যে দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যা সমূহকে পরিদর্শন করিতেন, বর্ত্তমান যুগেও চীনবাসীরা সেইরূপ দৃষ্টিতেই তাহা দেখিয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার মূলে শিক্ষার প্রয়োজন। কর্ম্মজীবন মানুষকে ঐশ্বর্য্য ও ও ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে। চীনদেশে বালকদিগের শিক্ষায় যে সাধারণ নীতিসমূহ অনুসৃত হয়, বালিকাদিগের শিক্ষা ব্যাপারেও তাহাই হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাধ্যয়ন প্রচলিত থাকিলেও মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে তাহার প্রতিকূলতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক বালিকা বিদেশে শিক্ষার জন্য গমন করিয়া থাকে। কিন্তু চীনদেশে ব্যাপক নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষয়িত্রীর অভাব। অর্থভাণ্ডারও আশানুরূপ নহে। বিরাট দেশের নরনারীর শিক্ষার জন্য যেরূপ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, চীনদেশের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তথাপি শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুত চলিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে চীনা বালিকারা পর্য্যন্ত চুরুটিকা সেবন করিয়া থাকে। 'জাজ' নৃত্যে অনেকেই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। পুরুষ বন্ধুর সহিত এক টেবলে বসিয়া আহার করা এখন চীনদেশে দুর্ল্লভ-দর্শন নয়। অনেক চীন বালিকা, একা পৃথিবীর দূর সীমা পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শিক্ষার সকল বিভাগেই চীনা নারী এখন প্রবেশ করিতেছে।

কিন্তু এই প্রগতিযুগেও চীনের সুপ্রাচীন বিবাহ বিধি অপরিবর্ত্তিত

আছে। বিবাহ চীন-নারীর ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ এবং জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের পূজা ও উপাসনা সহ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তবে নারীর প্রকৃত সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার জন্মে। কারণ, উত্তরাধিকারী প্রজনন ব্যতীত কন্যার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই চীনদেশে পত্নী সন্তান-জননী হইতে না পারিলে, স্বামী সে পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারেন এবং উপপত্নী গ্রহণ করিতেও পারেন। অবশ্য স্ত্রীর সম্মতি ক্রমেই এই কার্য্য হইয়া থাকে। উপপত্নী-গর্ভজাত সন্তানও পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় আইন সঙ্গতভাবে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া থাকে। উপপত্নী সন্তানবতী না হইলে, অগত্যা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে হয়। প্রধানতঃ গ্রহণকর্ত্তার কোনও ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রই পোষ্যপুত্র হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

চীন সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে বাকদান প্রথা আছে। "মেইজেন" বা মধ্যবর্ত্তী নামক ঘটক শ্রেণীর হাতেই এই ব্যাপার ন্যস্ত থাকে। এই ঘটকগিরি যেমন সম্মানজনক, তেমনই দায়িত্বপূর্ণ। উভয়পক্ষের ঠিকুজী, বয়স এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক বোধ হইলে, পরে সম্বন্ধ স্থির হয়। বিধবা বিবাহ বর্ত্তমান যুগেও চীনারা বিধি বহির্ভূত ও গর্হিত বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বাক্‌দানের জন্য নির্দ্দিষ্ট বয়স দশ বা দ্বাদশ। ইহার অপেক্ষা কম হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু বাকদান ব্যাপার অবশ্য-করণীয় বিধি। তবে প্রণয় ঘটিত বিবাহ চীনের অত্যাধুনিক সময়েও যে না হইতেছে, তাহা নহে। তবে সংখ্যা খুবই কম। পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় চীনদেশে বিবাহের বয়স গড়পড়তা অনেক কম। পঁচিশ-বৎসরের অবিবাহিত যুবক চীন সাম্রাজ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বিবাহ চীনদেশে মানবত্বের প্রধান পরিচয়। যে কোন

বয়সের অবিবাহিত পুরুষকে এখনও "খোকা" বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

পত্নীত্যাগ চীনের প্রাচীনতম প্রথা। বর্ত্তমানযুগের চীন রাষ্ট্র-নায়ক চিয়াংকাইসেকও প্রথমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সানইয়াৎসেনের সহোদরা সুংএর পাণিপীড়ন করেন। বন্ধ্যাত্ব, চরিত্রহীনতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বাচালতা, চৌর্য্য প্রবৃত্তি, স্বামীর পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা এবং কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তা এই সাতটি দোষের যে কোনও একটি অপরাধে পত্নীত্যাগের ব্যবস্থা চীন সমাজে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

চীনের সামাজিক রীতিতে স্ত্রী পুরুষের পৃথকীকরণ বর্ত্তমান যুগেও প্রচলিত। প্রাচীন-পন্থীদের ভোজ পর্ব্বে নারীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা মধ্যপন্থী, তাঁহারা অতিথি অভ্যাগম-কালে পরিবারের নারীদিগকে অভ্যর্থনার অধিকার প্রদান করেন বটে, কিন্তু ভোজ আরম্ভ হইলেই নারীরা অন্তরালে চলিয়া যান। যাঁহারা পূর্ণ নব্যপন্থী, তাঁহারা পত্নী কন্যা প্রভৃতির সহিত পাশ্চাত্য প্রথারই অনুসরণ করেন।

চীনদেশে একশ্রেণীর নারী আছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ পুরুষ সংস্পর্শহীন জীবন যাপন করেন। ইঁহারা বৌদ্ধব্রতচারিণী সন্ন্যাসিনী বা ভিক্ষুণী। চির-কৌমার্য্য ইঁহাদের জীবন ব্রত। চীন ভাষায় ইঁহাদিগকে "কু-জি" বলা হয়। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্গে ইঁহারা পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করেন। তখন নূতন নামে তাঁহাদের পরিচয় হয়। ষোড়শবর্ষ বয়স না হইলে কোনও কুমারীকে ভিক্ষুণীর সকল প্রকার অধিকার প্রদত্ত হয় না। এই সকল সন্ন্যাসিনী মুণ্ডিত শীর্ষা। বহুভাঁজ বিশিষ্ট বসনে তাঁহাদের দেহ আবৃত, চরণতলে পুরু সুকতলাযুক্ত পাদুকা।

প্রগতিযুগের পূর্ব্বে চীনা নারীর চরণ যুগল ক্ষুদ্রতম হইলেই তাঁহাকে

সুন্দরী আখ্যা দেওয়া হইত। লৌহ পাদুকা-মণ্ডিত চরণ যুগল এমনই ক্ষুদ্র হইয়া থাকিত যে, সুন্দরীর পক্ষে চলাফেরাও কষ্টকর হইত। কিন্তু চীন সে আদর্শ ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য সুকেশা নারী এখনও চীন-সমাজে বরেণ্যা। চীন সুন্দরীদিগের বহু বর্ণনা বহু পাশ্চাত্য লেখকের রচনায় পাওয়া বায়।

বর্ত্তমানযুগে চীনের নারী জাগরণ বিস্ময়কর। মধ্যবিত্ত অবস্থার চীনা নারীকে জীবিকার্জ্জনের জন্য এখনও কলকারখানায় বহুল পরিমাণে চাকরী গ্রহণ করিতে হয় না। কারণ, চীনদেশে একান্নবর্ত্তী সমাজ ব্যবস্থা প্রবল। কিন্তু চীনা শিক্ষিতা নারীরা দেশের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এযুগে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বাধীনতা বক্ষার জন্য চীন নারী সর্ব্বস্ব পণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছে। এই শিক্ষার মূলে রাষ্ট্র নায়ক চিয়াং কাইসেক ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সুংয়ের প্রাণপণ চেষ্টা বিরাজিত। বলশেভিক রাসিয়ার কম্যুনিজমের আদর্শও চীনের নানাস্থানে অনুসৃত হইতেছে।

চীনা পুরুষ ও নারীদিগের মধ্যে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। তন্মধ্যে সুন্দরী তরুণীদিগের খেঁকশেয়ালের দ্বারা আবিষ্ট হওয়া অন্যতম। খেঁকশেয়াল নাকি মানুষ মূর্ত্তিতেও রূপান্তরিত হইতে পারে। সুন্দরী যুবতীদিগের প্রতি তাহাদের নাকি প্রচণ্ড লোভ।

বর্ত্তমানে এই প্রকার কুসংস্কার তাড়াইবার ব্যবস্থা চীনদেশে হইয়াছে। সাংহাই, হাংকো, ক্যান্টন, টিনসিন প্রভৃতি নগরে দরিদ্র শ্রেণীর নারী ও বালিকারা জীবিকার্জ্জনের জন্য কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কুসংস্কার প্রবল। প্রচারের ফলে স্ত্রীলোকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ধর্ম্ম ঘট করিয়া থাকে। এমন কি সাধারণ সভা সমিতিতে

তাহারা বক্তৃতা করিয়া থাকে। সুতরাং কুসংস্কার হইতে ধীরে ধীরে এই শ্রেণীর নারীরাও মুক্তিলাভ করিতেছে।

চীনদেশে নৌজীবন প্রচলিত। অর্থাৎ অনেক পরিবার নৌকায় জীবন যাপন করিয়া থাকে। এই সকল পরিবারের নারীরা চীনদেশের সংস্কার হইতে মুক্ত নহে। নারীরা সাধারণতঃ স্বামিসেবাপরায়ণা, সন্তানপালনে সুমাতা, গৃহিণীপনায় দক্ষ। সমগ্র চীনজাতির নারী সমাজই সতীত্বধর্ম্মের অনুরাগিণী। আধুনিক যুগের নারীদিগের মধ্যেও নারীর এই আদর্শ এখনও প্রবল।

শ্যাম ললনা

ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন এবং বৃটিশ শাসিত ব্রহ্মদেশের মাঝে যে রাজ্য অধিষ্ঠিত, তাহাই শ্যামরাজ্য। এই দেশে নদী ও খালের সংখ্যা নাই। ভেনিসের সহিত এজন্য শ্যামদেশকে ইউরোপীয়গণ তুলনা করিয়া থাকেন।

শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি ইন্দোচীন প্রদেশ সমূহে নারীর আসন, আচার, রীতি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান। এক সময়ে এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ভারতীয় কৃষ্টি হারাইয়া এই সকল অঞ্চলের নর নারীরা স্ব-ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্যামরাজ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, বৌদ্ধ মন্দির অভিমুখে পূজারিণী শ্যাম-অঙ্গনাগণ দলে দলে চলিয়াছে। প্রভাতে শ্যাম ললনাকুল চা, চাউল সিদ্ধ বেণু শাখা লইয়া মন্দির অভিমুখে চলিয়াছে—তাহাদের পশ্চাতে অন্যান্য পূজারিণী।

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্যামরাজ্যে নারী সংসারের তৈজসপত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। কাহারও গৃহে কন্যা সন্তান প্রসূত হইলে আনন্দ উৎসবের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইত না। বিবাহে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা তখন বিদ্যমান ছিল।

বর্ত্তমানযুগে সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রহ্মবাসিনীদিগের

ন্যায় শ্যাম-ললনাকুল ব্যক্তিত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছে। সকল বিষয়ে শ্যাম-নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে।

অধিকাংশ পরিবারের নারীরা স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। বসন ভূষণে শ্যাম-ললনাদের আড়ম্বর তেমন নাই—তাহারা বিলাসিনী নহে। তাহাদের গাত্রবর্ণ পীতাভ, মাথার কেশ নীলাভ কাল, ছোট করিয়া ছাঁটা। প্রসাধন সাহায্যে নারীরা দাঁত কাল করিয়া রাখে। কিন্তু তথাপি তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া মানবের মন অভিভূত হয়।

বেশভূষায় অনাড়ম্বর হইলেও শ্যাম তরুণীদিগের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, তাহারা ধনী চীনাকে বিবাহ করিতে চাহে। যাহারা অলঙ্কার প্রিয়, স্বজাতিকে তাহারা বিবাহ করিতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

নগ্নবিলাসে শ্যামসুন্দরীদের তেমন আগ্রহ বা রুচি নাই।

ব্যাঙ্ককের নারীরা পুরুষের মত মালকোঁচা আঁটিয়া কাপড় পরিধান করে। উপরে বক্ষোবাস মোটা চাদর। এই বক্ষোবাস রঙ্গীন বর্ণ বৈচিত্র্য বহুল বস্ত্রে তৈয়ার হইয়া থাকে। এই বেশে সুন্দরীদিগকে মনোহারিণী দেখায়, মাথার কেশ সকলেই ছোট করিয়া ছাঁটিয়া থাকে। তাহার ফলে নারীর রমণীয়তা খর্ব্ব হয়।

সন্তান-জননী হইবার সময় শ্যাম ললনারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে মাসাধিক কাল বসিয়া থাকে। কখনও অগ্নিকুণ্ডের দিকে মুখ করিয়া কখনও বা পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা। যে কক্ষে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার ধূম নির্গমনের জন্য একটি মাত্র ছিদ্রপথ থাকে। এরূপ অবস্থায় আসন্ন প্রসবা নারীর একমাস অবস্থান দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাপ্রদ। কিন্তু আবহমানকাল হইতে প্রচলিত এই প্রথা বর্ত্তমান যুগেও শ্যাম-ললনারা ত্যাগ করে নাই।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, গৃহের বয়োবৃদ্ধা নারী চাউল নির্ম্মিত তিনটি নাড়ু তিন দিকে নিক্ষেপ করেন। ইহার অর্থ, ভূত প্রেত নাড়ুর প্রভাবে পলায়ন করিবে। সদ্যোজাত শিশুর উপর তাহাদের কুদৃষ্টি যাহাতে না পড়ে সেই জন্য এইরূপ প্রথা বিদ্যমান। পরে ঐ নাড়ুগুলি কুকুর বিড়ালকে ভক্ষণের জন্য প্রদান করা হয়।

সন্তান প্রসূত হইলে গণককে আহ্বান করা হয়। তিনি গণনা করিয়া বলিয়া দেন, শিশু শুভ কি অশুভ ক্ষণে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কন্যার পক্ষে যাহা শুভদিন, সেদিন পুত্রের পক্ষে অশুভ। এজন্য বেয়াড়া অশুভ দিনে পুত্র বা কন্যা জন্মিলে, পুত্রের নাম মেয়েলী ছাঁদে এবং কন্যার নাম পুরুষালী ছাঁদে রাখিবার ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগেও প্রচলিত।

শ্যামরাজ্যে কোনও কন্যার ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অঙ্গে কোনও প্রকার বসন বা আবরণ দিবার ব্যবস্থা নাই। ছয় বৎসর বয়সে মেয়েরা শাড়ী পরিধান করে। নগর বা পল্লী সহরের মেয়েরা ৬ বৎসর বয়স হইতে বক্ষোবাস পরিধান করে। দ্বাদশী কন্যা না হইলে মেয়েদের লেখা পড়া আরম্ভ হয় না। কিন্তু গীতবাদ্য শিক্ষার ব্যবস্থা তৎপূর্ব্বেই হইয়া থাকে। এগার বার বৎসরের শ্যাম-বালিকারা গৃহের বাহিরে প্রেমের গান গাহিয়া বেড়াইলে তাহাতে দোষ হয় না। সে সম্বন্ধে কোনও বিধি নিষেধের বালাই নাই।

অল্প বয়স হইতেই মেয়েদিগকে কাজ শেখান হইয়া থাকে। শ্যামদেশে প্রচুর রেশমকীট উৎপন্ন হয়। সেই কীট পালন ও গুটি হইতে রেশম বাহির করার কাজ তাহারা শিখে। রেশমী সূতার সাহায্যে বস্ত্র বয়ন বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

একাদশ হইতে ত্রয়োদশবর্ষ বয়সের মধ্যে মেয়েদের মাথার কেশ ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সের পর মাথায় দীর্ঘ কেশ

রাখিবার বিধি শ্যাম দেশে নাই। এই কেশ কর্ত্তন একটা উৎসব বিশেষ। মহাসমারোহে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

সোনালী শাড়ী পরাইয়া বিবিধ ভূষণসজ্জিতা বালিকাকে শোভাযাত্রা সহ রাজ প্রাসাদে আসিতে হয়। দেশের রাজা স্বয়ং এই উৎসবের পুরোহিত। রাজধানীর বাহিরে, রাজ সরকারের কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। এই উৎসব দিনের জন্য অতি দরিদ্র পিতামাতাও উল্লসিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

চম্পাউৎসব শ্যামনারীর দ্বিতীয় উৎসব। এই উৎসবে বিবাহযোগ্যা কন্যা বরের পাণি প্রার্থনা করিয়া থাকে। পূর্ব্ব হইতে বিবাহের ঘটক পাত্র পাত্রীর বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিয়া রাখে। তারপর বর এবং কন্যা উভয় পক্ষের বহু তরুণ যুবক কন্যাগৃহে আমন্ত্রিত হয়। কন্যা তাহাদের সঙ্গে হোলি খেলা করিয়া থাকে। গৃহ-ভোজে মহিষ ও শূকর বলি হয়। হোলি খেলার পর কন্যা বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার হাতে তখন তাম্বুল, চাউল চূর্ণ, সুপারি, খদির, সিদ্ধ মাছ, রেশমীবস্ত্র, সূতিবস্ত্র প্রভৃতি থাকে। বর ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া কন্যার হাতে রূপার বাট মূল্য স্বরূপ প্রদান করে।

এই মূল্যদান ব্যাপার সম্পন্ন হইবার পর বর ও কন্যা পাশাপাশি উপবেশন করে। তাহাদের সম্মুখে তখন একটি পিত্তল নির্ম্মিত আধারে দুইটি ডিম্ব, একটি মুরগী এবং কিয়ৎ পরিমাণ সুরা রক্ষিত হয়। পল্লীর ঐন্দ্রজালিক উহা বর ও কন্যার হাতে তুলিয়া দেয়। ইহার পর বরের সঙ্গে কন্যার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। তারপর বর বধূকে লইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসে। বরের বাড়ীতে বিশেষভাবে সোপান শ্রেণী নির্ম্মিত থাকে। বর কন্যাকে সমতালে পা

ব্যায়াম সুগঠিতা দেহা আধুনিকা বাঙ্গালী তরুণী

ফেলিয়া এই সোপানে উঠা নামা করিতে হয়। তিনদিন পরে বর তাহার বধূকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসে। তারপর পিতৃগৃহ হইতে কন্যার চিরবিদায়ের পালা আসে। স্বামীর গৃহে তারপর নূতন সংসার রচনার জন্য বধূ চলিয়া যায়।

বিবাহের আর একটি প্রথা আছে। উহা প্রাচীন প্রথা। এই প্রথার নাম কন্যাহরণ। এই প্রথা যেমন বিচিত্র তেমনই কৌতুকাবহ। রাত্রিকালে বাড়ীর পরিজনগণ নিদ্রিত হইলে, কন্যা ভাঁড়ার ঘরে চাউল পূর্ণ ধামা বা পাত্রে একটি রজতমুদ্রা রাখিয়া দেয়। এই বিধির অর্থ এই যে, পালন ব্যয় সে ধরিয়া দিতেছে। তারপর কন্যা নিঃশব্দে গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। বর তাহার প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অপেক্ষা করে। কন্যাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়াই, বর তাহার হাত ধরিয়া নিজগৃহে লইয়া যায়। পিতৃগৃহের বাহিরে করধারণ মাত্রই পাণিগ্রহণ বা বিবাহ নিষ্পন্ন হইল বুঝিতে হইবে। যদি কন্যার পিতা, ভ্রাতা, মাতা, বা অপর কোনও আত্মীয় বন্ধু সেই সঙ্গে যদি বরের নিকট হইতে কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া গৃহে আসিতে পারে, তাহা হইলে এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ সেই মুহূর্ত্তেই অসিদ্ধ হইয়া যায়। তবে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উহা করা চাই। নহিলে এই বিবাহ বন্ধন অটুটই রহিয়া যায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা শ্যামদেশে বিদ্যমান আছে। স্বামী যদি বিবাহ চ্ছেদ করে, তাহা হইলে শ্বশুরের প্রদত্ত যৌতুকাদি সবই বরকে ফিরাইয়া তে হয়। আর কন্যার পক্ষ হইতে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে রপক্ষ কন্যার মূল্য বাবদ যত অর্থ দেয়, তাহার দ্বিগুণ ফিরাইয়া দিতে হয়।

পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল, কুলটা বা ব্যভিচারিণী নারীকে উপপতি সহ শাঘাতে জর্জ্জরিত করা। বর্ত্তমান প্রগতিযুগে সে প্রথা বন্ধ হইয়াছে। ন ব্যভিচারিণী নারী ও তাহার উপপতি যদি স্বামীকে খেসারৎ প্রদান

করে, তাহা হইলে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। এই খেসারতের পরিমাণ উপপতির পক্ষে ১২ খানা রূপার খাট, নারীর পক্ষে ছয় খানা।

শ্যামরাজ্যে ধনিসমাজে বহু বিবাহ প্রথা এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু যে, যত বড় ধনীই হউক না কেন, বধূ নির্ব্বাচনে বরের কোনও অধিকার নাই। বরের আত্মীয়গণ বধূ নির্ব্বাচন করিয়া দেয়।

পুত্র কন্যার মৃত্যু হইলে, পিতামাতার অশৌচ পালন করিতে হয় না। কিন্তু পিতৃবিয়োগে সন্তানের পনের মাস অশৌচ পালন করিতে হয়। মাতৃবিয়োগের অশৌচ ৩ বৎসর কাল স্থায়ী। মাতৃবিয়োগে কুকুর, চিংড়ী মাছ ও ভেকমাংস ভোজন নিষিদ্ধ।

কাহারও মৃত্যু হইলে, দেহ শবাধারে রক্ষা করা হয়। অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজন সেই শবাধারের কাছে বসিয়া পাহারা দিয়া থাকে। তারপর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তারপর মুক্তপ্রান্তর বা নদীর তীরে শব আনীত হয়। চিতায় শবদেহ অর্দ্ধ দগ্ধ করা শ্যামদেশের রীতি। সে সময় মৃতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনের জন্য মৃতের আত্মীয় স্বজন সকলেই উপস্থিত থাকে।

অর্দ্ধ দগ্ধ শবদেহ তারপর মন্দির সংলগ্ন ভূমিতে সমাহিত করা হয়। যাহারা সমাধি দিতে না পারে, তাহারা মৃতদেহ কোনও বিজন প্রান্তর বা নদীতীরে ফেলিয়া দেয়।

দেবদাসী প্রথা এখনও শ্যামরাজ্যে প্রচলিত আছে। দেবদাসীদিগের বিবাহ হয় দেবতার সহিত। দেবদাসীরা মন্দিরে বাস করিয়া থাকে। দেবতার তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহারা নৃত্যগীত করিয়া থাকে। নৃত্য লীলা তাহাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা করিতে হয়। শিশু বয়স হইতে দেবতার কাছে তাহারা সমর্পিত হয়। যৌবন সমাগমে তাহারা রাজগণিকারূপে প্রাসাদের অন্তঃপুরে স্থান লাভ করে।

মার্কিণ ললনা

বর্ত্তমান সভ্য জগতে আমেরিকার নাম তালিকার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধ্বজা মার্কিণ মহিলারা যে ভাবে ধারণ করিয়া জগতের বক্ষে বিচরণ করিতেছেন, তাহাতে বিশ্ববাসী বিস্ময়বিমূঢ়। আধুনিকতম মার্কিণ মহিলার আদর্শ গ্রহণ করিয়া জীবন যাত্রার পথে বহু সভ্য দেশের নারী-সমাজ অগ্রবর্ত্তিনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ডারউইন, হক্সলে প্রমুখ বিবর্ত্তনবাদী যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই, বিশ্বযুদ্ধের পর মানব সমাজে মার্কিণ মহিলারা তাহারও অপেক্ষা বিস্ময়জনকভাবে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছেন। সুসভ্য মার্কিণ দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই নারী প্রজাপতির বিচিত্র রূপ দর্শনে মানব মাত্রেই বিমুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিবে।

মার্কিণ মহিলারা ইদানীং হটেনটটদের ন্যায় চুল ছাঁটিয়া খর্ব্বতম করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের পরিধেয় "স্কার্ট" হাঁটুর কাছে আসিয়াই বিদায় লইয়াছে। সুন্দরী নারীর মুখে চুরুটিকা এখন সাধারণ দৃশ্যের মধ্যে পরিগণিত। চুরুটিকার ধূমে শুধু বৈঠকখানা বা শয়ন কক্ষ নহে, রাজপথ পর্য্যন্ত ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কর্ণের দুল এখন আর কেশরাজির প্রান্তে আত্মগোপন করে না, নগ্ন কর্ণ সীমায় দোদুল্যমান হইয়া দর্শকের চিত্ত বিভ্রম উৎপাদন করে। আপাদমস্তক দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যাইবে,

উড্ডীয়মান প্রজাপতির মত মার্কিণ নারী দিকে দিকে ধাবিত হইতেছেন। বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের প্রজাপতির দল বর্ত্তমান সময়ে রূপান্তরিত হইয়া অভিনব প্রজাপতির মত ফুলের গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রত্যেক প্রজাপতির একজোড়া নগ্ন জানু, ২টা মোজা, ১জোড়া চশমা, ১টা ওষ্ঠানুলেপন সহ যষ্টি, ১টা জানুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত স্কার্ট, পাউডারের পফ্, সহস্র কেশ, ৩২টা চুরুটিকা এবং কিশোর বন্ধু দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই বর্ণনা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা "জুনিয়র ম্যাগাজিন" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমেরিকার বড় বড় সহরে এই বর্ণনার অনুরূপ সংখ্যাতীত মার্কিণ প্রজাপতি যত্র তত্র দৃষ্টিগোচর হইবে। রাজপথ, স্কুল, কলেজ, কারখানা, অপিস গৃহ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রমোদোদ্যান, সমুদ্রতটের স্নান ঘাটে, পথচারী বাস্, মোটরগাড়ী, নৃত্যাগার রঙ্গালয়—সর্ব্বত্রই এই প্রজাপতির বাহার। জলে স্থলে কোথাও এই প্রজাপতির অভাব নাই। পুলিস কোর্ট, ফৌজদারী আদালত সমূহে প্রজাপতির সংখ্যা-বৃদ্ধি দিন দিন ঘটিতেছে। এমনও দেখা যাইবে, মার্কিণ প্রজাপতি কোনও পথচারীকে দাঁড় করাইয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়াছে, দস্যুদলকে কোনও ব্যাঙ্কে পথ দেখাইয়া তাহার অর্থ লুণ্ঠনের জন্য লইয়া গিয়াছে—রাত্রিকালে নহে, দিবাভাগে, প্রখর সূর্য্যালোকে এই সকল কার্য্যে মার্কিণ প্রজাপতির অগ্রগমনে বিন্দুমাত্র বাধা ঘটে না।

কুমারী প্রজাপতি অনেক রাত্রিতে গৃহে ফিরিলে, প্রাচীন মতাবলম্বী পিতামাতা তাহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে,

সে পিস্তল লইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বসে। বিংশশতাব্দীর নারী হইয়া সে বাজে কোন আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিবে না। যদি ধর্ম্মযাজক এই শ্রেণীর নারী প্রজাপতির ছাঁটা চুল, খাট স্কার্ট ও বর্ণানুলিপ্ত গণ্ডদেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন প্রায়ই তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত লভ্য হইয়া থাকে।

মার্কিণ প্রজাপতির বয়সের কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। ষোড়শী হইতে ষষ্ঠীবর্ষীয়া নারী প্রজাপতির প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। কুমারী, বিবাহিতা পত্নী, সন্তান জননী বা মাতামহী পিতামহী প্রজাপতির অভাব নাই।

সভ্যজগতের তরুণী সম্প্রদায়ে গৃহের প্রভাব বিস্ময়জনকভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহার নিদর্শন সমধিক। ছোট সহর বা পল্লী অঞ্চল হইতে তরুণীরা দলে দলে প্রতি বৎসর বড় বড় সহরে পলায়ন করিয়া আসে। ক্ষুদ্র সহর বা পল্লীর একঘেয়ে জীবন যাত্রা তাহাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে না বলিয়াই তাহারা বড় বড় সহরে আমোদের আশায় চলিয়া আসে। বড় বড় সহরে আসিয়া তাহারা এমন পুরুষ ও নারীর সহিত মিলিত হয় যে, কোনও প্রকার পাপ ও অধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহারা উত্তরকালে বিরত হইতে পারে না।

চিকাগোর "পর্য্যটক সেবাসমিতির" পরিচালিকা মিসেস্ এলিস্ ম্যাক্‌মাষ্টার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ষান্মাষিক বিবরণ তালিকায়, এইরূপ ৩৪ হাজার ৬ শত ৭৬ জন বালিকা বা কিশোরীর ভার লইয়াছিলেন। বহু ভদ্রঘরের তরুণী এই পলায়িতা দলের মধ্যে ছিল। শুধু যে সকল বালিকা, কিশোরী বা যুবতী উক্ত সমিতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাদেরই সংখ্যা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে নাই, তাহাদের সংখ্যা যে কত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। উক্ত সমিতি ঐ সকল তরুণীকে তাহাদের পিতামাতা বা

অভিভাবকগণের কাছে ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায়, এক চিকাগো সহরেই বৎসরে লক্ষাধিক কিশোরী বা তরুণী পল্লী সহর হইতে পলায়ন করিয়া আসে। অবশ্য এই সংখ্যা নিম্নতম বলিয়াই অভিজ্ঞগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বৃহৎ সহরেও এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। ছোট ছোট বালক বালিকাও এইভাবে আমোদ প্রমোদের শিহরণ লাভে. ধন্য হইবার জন্য বড় বড় সহরে আসিয়া থাকে।

সাধারণ নৃত্যাগার সমূহে বহু তরুণ তরুণী শত শত সংখ্যায় নিত্য মিলিত হইয়া থাকে। মিস্ জেন্ এডামস্ লিখিয়াছেন, (ইনি যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত সমাজ সংস্কারক), প্রকাণ্ড নৃত্যাগারে শত শত যুবক যুবতী আমোদ প্রত্যাশায় আকৃষ্ট হইয়া সমবেত হয়। এ বিষয়ে মিস্ জেন্এডামস্ যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করাও এদেশের নরনারীর পক্ষে শোভন হইবে না।

"A New conscience" নামক গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, "প্রত্যেক বড় সহরে সহস্র সহস্র তরুণ তরুণী আত্ম সংযমের শিক্ষা আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই। অসভ্য বর্ব্বরদিগের মধ্যেও যে আত্মসংযম ও শালীনতা দৃষ্ট হয়, যৌন ক্ষুধা পরিতৃপ্তির বিরুদ্ধে তাহাদের মধ্যেও যে শিক্ষাবিধি প্রচলিত, যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ তরুণীর মধ্যে তাহাও প্রদত্ত হয় না।"

উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রজাপতিরা তাহাদের পুরুষ বন্ধুদিগকে লইয়া বিচরণ করে। লিণ্ডসে লিখিয়াছেন "তরুণীরা কি করিয়া ভ্রমের সাংঘাতিক পথে বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া পর্য্যটন করে, তাহার কোনও তালিকা নাই বটে, তবে আমার এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে, তাহারা প্রচুর মদ্য পান করিয়া বিবেক বুদ্ধিকে হারাইয়া ফেলিয়া

থাকে।—Ben. B. Lindsay, The Revolt of Modern Youth —p. 51.

কাফে, রেস্তোরাঁ, হোটেল প্রভৃতি স্থানে যে সকল তরুণী কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সেই সকল স্থানে প্রলোভনের সম্মুখীন হইয়া পদস্খলিত হইয়া থাকে। আমেরিকা ঐশ্বর্য্যের কুবের ভাণ্ডার হইলেও, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা অল্প বেতনে তরুণীদিগকে নিযুক্ত করে। সেজন্য পুরুষরা তাহাদিগকে কিছু বকশিস করিলেই কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাহারা উহা গ্রহণ করে। এইজন্যই তরুণীদিগের পদস্খলন ঘটিয়া থাকে—"A New conscience p. p. 64—69.

গণিকাবৃত্তি নিরোধ বিল আমেরিকায় পাশ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে কাহারা বা কয়জন গণিকাবৃত্তি করে, তাহা পুলিসের বিবরণেও পাওয়া কঠিন। কারণ গণিকাবৃত্তি প্রকাশ্যভাবে বন্ধ হইলেও অন্যভাবে তাহা চিকাগো প্রভৃতি সহরে বিদ্যমান আছে।

আমেরিকার সুধীসমাজ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এইসকল অনাচার দমনের জন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। পুলিশ, গোয়েন্দা, ফৌজদারী আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অগ্নিমুখী, বেপরোয়া তরুণীদিগের সংশোধন কল্পে অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু প্রতিবিধান ব্যবস্থা অবৈধ ইন্দ্রিয়স্রোত নিরুদ্ধ করিতে পারিতেছে না এবং তাহার ফলে যে সকল হত্যা প্রভৃতি সংঘটিত হইতেছে, তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা বিফলপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

মার্কিণ পুলিসের প্রসিদ্ধা নারী-পুলিস মিসেস্ আনা লৌকস্ আধুনিকা মার্কিণ তরুণীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"স্বাধীন প্রেম, পরীক্ষামূলক বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, আধুনিকা তরুণীদিগের বিশ্রম্ভালাপের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড উইলিয়ম সাণ্ডে লিখিয়াছেন, "আধুনিকা নারীরা বস্তুতন্ত্রের উপাসিকা। বস্তুতন্ত্রের চাপে আধ্যাত্মিকতা পিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির ঘুর্ণিপাকে আধুনিকা নারী ডুবিয়া মরিতেছে। তাহারা এখন যে সকল কথা বলে, যে সকল কার্য্য করে, দশ বৎসর পূর্ব্বে সে কথা সে কার্য্য দুর্নীতিজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। কোনও জাতি নারীত্বের এই প্রকার নিম্ন আদর্শ লইয়া বৃহত্তর ও মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। আধুনিকা তরুণী ও তরুণরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। আধুনিক নৃত্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিরক্তিকর ও ও অবাঞ্ছনীয়।"—Tragedies of Modernism p. 52.

ইউরোপের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশেও যৌবনের দীপ্ত শিখার জ্বালাময় অবস্থায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তিফৌজের জেনারেল বুথ লিখিয়াছেন, "আমাদের দেশের যুবকদিগের চরিত্রের বিশৃঙ্খলা, তরুণীদিগের স্বৈরাচার পরায়ণতা, কারখানা এবং বিদ্যালয় সমূহেও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা নৈরাশ্যজনক অবস্থা। "In Darkest England and the way out." p. 66.

গার্হস্থ্য জীবন আমেরিকায় ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। চিন্তাশীল আমেরিকাবাসীরা এ সম্বন্ধে মার্কিণ জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিবার ত্রুটি কারখানায় করিতেছেন না। ডবলু গ্রাভেন লিখিয়াছেন, "বিবাহিতা নারীরা অধিক সংখ্যায় কারখানায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে গার্হস্থ্য জীবনের সমূহ অমঙ্গল ঘটিতেছে। সকাল ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত মাতা যদি গৃহে না থাকে, সে গৃহের কি দুরবস্থা ঘটে, তাহা সহজেই অনুমেয়। লক্ষ লক্ষ তরুণী কারখানায় জীবন যাপন করিতেছে, তাহার ফলে তাহারা বিবাহিত অবস্থায় কি ভাবে গৃহ ধর্ম্ম পালন করিবে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নহে।—"Social Facts and Forces, p. p. 29—30.

আমেরিকান "রিভিও অব রিভিউজ" পত্রে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ সংখ্যায় "The passing of the Family" নামক প্রবন্ধ, এবং "Atlantic Monthly, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়ও এই বিষয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধ সমূহে বহু গবেষণা হইয়াছে। সকলেই মার্কিণ সমাজে গার্হস্থজীবনের কিরূপ দ্রুত অবসান ঘটিতেছে তাহার আলোচনা বিশদ ভাবে করিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা শঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৬ হাজার। উক্ত বৎসরে হাজার করা ১০.২৬ জনের বিবাহ হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ঐ বৎসরে হাজার করা ১.৫৪। যুক্তরাষ্ট্রে ইদানীং শতকরা ১.৫ জন লোক মাত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে। ইহা মার্কিণের পক্ষে আশঙ্কাজনক। যেরূপ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে জন সংখ্যা বৃদ্ধি আরও হ্রাস পাইবার আশঙ্কা।—Tragedies of Modernism. P. 61.

অনেক মার্কিণ মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য অধুনা প্যারীতে যাইতেছেন। কোন কোন মার্কিণ ষ্টেটে সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। নেভাডায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহের সংখ্যা ১০৯৭ ছিল। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা ১০৩৭ হইয়াছিল। আমেরিকায় বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা খুবই সহজ। ৪৭ প্রকার বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। বিবাহবিচ্ছেদকারী নরনারীরা স্থবিধামত যে কোন ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনসস্ বুরোর বিবরণে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮ শত ৬৮টা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। ইহাতে গার্হস্থ্যজীবনের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। —বিশপ এণ্ডারসনের বক্তৃতা।

অনেকক্ষেত্রে Companionate marriage বা পরীক্ষামূলক বিবাহ

(Trial marriage) যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়াছে। বিবাহিতা বা কুমারীদিগের মধ্যে ইহা সচল।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল এইচ, ডগলাস যান্ত্রিকযুগকেও বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ী করিরাছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নারীদিগের অন্যত্র নিযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হওয়ায় বিবাহিতা পত্নী স্বামী ত্যাগ করিয়া যায়। এই অবস্থা অত্যন্ত তিক্ত ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। নারী যতই নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিক্ষা করিতেছে, ততই পুরুষরা বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।"

মিস্ জেন এডাম্‌সও এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বিবেচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শ্রমশিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলেই আধুনিক নগরী গুলিতে দাম্পত্যজীবন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমেরিকায় পাপের স্রাতও ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকার সুবিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানবেত্তা সেণ্টলুইবেক ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক কার্য্য বিভাগের ডিরেক্টার ফ্রাঙ্ক জে, বুর্ণো উৎকণ্ঠাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছেন, "মানবজীবনে যতপ্রকার সংস্রব ঘটে তন্মধ্যে গার্হস্থ্য বা দাম্পত্যজীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেমন করিয়া নর ও নারী দাম্পত্যজীবনে এই পরম দায়িত্ব পালন করিবে, এই সমস্যাই এখন আমেরিকাবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।"

সভ্যতার আলোক দীপ্তি যতই উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে, সুসভ্য মানব সমাজে ততই অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক বিশ্ব সভ্য সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই আমেরিকাতেই ইদানীং অপরাধ-প্রবণতা, পাপের স্রোত প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে।

আর্থার ব্রিস্‌বেন নামক প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক লিখিয়াছেন, "যে যুগে আমাদের কারাগার সমূহ শূন্য করিবার কথা, বাতুলাগার সমূহ লোকাভাব অনুভব করিবে—পাপের অপরাধের সমাপ্তি হইবার কথা, অতি বিস্ময়ের ব্যাপার, সেই আমেরিকা, আমাদের দেশ, ইতিহাসে অতি ভীষণতম অপরাধের যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সংবাদপত্র খুলিবামাত্র ডাকাতি রাহাজানি, মানুষগুম এবং অন্য বিবিধ প্রকার অপরাধ ঘটিত কাহিনী প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হইবে।"

পূর্ব্বে যে সকল কঠিন হৃদয় অপরাধীর কথা শুনা যাইত, এখন তাহারা অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। সে স্থান অধিকার করিয়াছে তরুণ তরুণীরা। চিকাগোর "ক্রাইম কমিশন"এর ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট এডোয়ার্ড ই, গোর লিখিয়াছেন, "অপরাধ সংক্রান্ত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অপরাধ ব্যাপারে মার্কিণ তরুণীরাই ইদানীং প্রসিদ্ধ ভূমিকার অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।" তাঁহার প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইবে যে, ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা তরুণীরা অপরাধীদিগের শতকরা ৬০ ভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল তরুণী ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের বয়স সপ্তদশ হইতে বাইশের মধ্যে। দুঃসাহসিকা তরুণীরাই এ কার্য্যে সমধিক অগ্রসর। মিঃ গোর এ বিষয়ে যে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, পুথি বাড়িয়া যাইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অনেক তরুণী সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জনে বিশ্বাস করে না। তাহারা লেখাপড়া শিখিয়াও এমনই দুর্নীতিপরায়ণা হইয়াছে যে, মোটর চুরি করিয়া অন্যত্র বিক্রয় করিবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। "চিকাগো সান্‌ডে ট্রিবিউন" পত্রে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত হইয়াছে "বেশ শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী তরুণীরা সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন

করিতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাহারা উচ্চ শিক্ষিতা হইয়াও চৌর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত।”

যুক্তরাষ্ট্রের তরুণী অপরাধিনীর সংখ্যা দ্রুততর বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা অপরাধ-প্রবণ কার্য্যে পুরুষকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব।—“Tragedies of Modernism” p. I38.

উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি ধারণ করিয়াও বহু তরুণী পাপের পথে দিশাহারা হইয়া ধাবিত হইতেছে। মার্কিণ জাতির এই ভীষণ অবস্থা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড ডব্‌লু সণ্ডে লিখিয়াছেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষাই তরুণ তরুণীদিগের নৈতিক অধঃপতনের হেতু। বস্তুতন্ত্রবাদীরা দেশের বস্তুতান্ত্রিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন নেতারা যেরূপ জঘন্য শিক্ষা বিলাইতেছেন, তাহারই ফলে তরুণ তরুণী-দিগের নৈতিক অধঃপতন এমন শোচনীয় ভাবে সংঘটিত হইতেছে যে, পরবর্ত্তী বংশধরদিগের দ্বারা তাহার সংস্কার সাধনও অসম্ভব হইয়া পড়িবে।”

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষ অপরাধীরা এমনই চতুর যে, তাহারা ধরা পড়ে না। এখনও ১ লক্ষ ৩৫ হাজার হত্যাকারী নরনারী আমেরিকার বুকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও বিদ্যার প্রভাবে নূতন নূতন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে ধরিবার উপায় নাই। প্রগতিবাদের অর্থ যদি পাপ ও অপরাধ প্রাবল্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সে বিষয়য় প্রথম পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে।—Tragedies of Modernism. p. 171.

আমেরিকা ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জনে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছে, কিন্তু নীতি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে সেরূপ প্রচেষ্টা করিতেছে না।

আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট। দেশের নর নারীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার আয়োজন বিস্ময়কর। বহু মনীষী পুরুষ ও মহিয়সী মার্কিণ মহিলা দেশের তরুণ তরুণীর কল্যাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগও করিয়াছেন। কিন্তু যীশুখৃষ্টের প্রচারিত বাণী আমেরিকায় যেভাবে উপেক্ষিত, তেমন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এমন কি বহু রাষ্ট্রনীতিক এমন কথাও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে বা মনুষ্য জীবনের কার্য্য ব্যবস্থায় যীশুখৃষ্টকে বাদ দিয়া চলাই ঠিক। অতি প্রাচীনকালে যীশুখৃষ্ট যে বাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ যুগে অচল।

আলডাস্ হক্‌স্‌লে লিখিয়াছেন, "বহু পুরুষ ও নারী উচ্চতর জীবন যাপনের অনুরাগী নহে। তাহারা পশুর নিম্নতম বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই আগ্রহশীল। যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। * * * রোম, নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনের অনেক অধিবাসী এই পন্থারই ভক্ত।"

আমেরিকায় যীশুখৃষ্টের বাণী, সৌভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরপরায়ণতা নারীর মধ্যে বিস্ময়করভাবে হ্রাস পাইয়াছে। তাহারই ফলে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য বিবাহ, পরীক্ষামূলক বিবাহ এবং মাতৃত্ব বর্জ্জন ব্যবস্থা নারীসমাজে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মনীষী মার্কিণগণ দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মার্কিণ প্রগতিবাদী তরুণতরুণী সর্ব্বনাশের পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। তাহা হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার সার্থক ব্যবস্থা এখনও প্রবল হইয়া উঠে নাই। তবে মিসেস্ রসেল সেজ এবং মিসেস্ এডোয়ার্ড হ্যারিমানের মত মহিয়সী মহিলারা তাঁহাদের প্রচুর ধনসম্পদ দেশের কল্যাণকার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। মিস্ এলেন ব্রাউনিংস্ক্রিপস্ কোটিশ্বরী। তিনি

তাঁহার সর্ব্বস্ব মার্কিণনরনারীর কল্যাণকল্পে দান করিয়া গিয়াছেন। দেশের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন হইয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই।

মার্কিণ নারী সমাজে বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রচুর উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যাইবে। দুঃসাহসিক কার্য্যেও মার্কিণ ললনা কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া নাই। গারট্রুড এডারেল নাম্নী এক অষ্টাদশী মার্কিণ তরুণী সমুদ্র সন্তরণে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সন্তরণকারিণী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মেক্সিকো নারী

দক্ষিণ আমেরিকায় মেক্সিকো প্রকাণ্ড দেশ। কর্টেজ মেক্সিকো জয় করিয়া সেখানে স্প্যানিশ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা পঞ্চাদশ শতাব্দীর কথা। আধুনিক মেক্সিকানদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন মিশ্র বর্ণ সঙ্কর। বর্ত্তমানে জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। ইহার মধ্যে শতকরা ১৯ জন শ্বেতাঙ্গ, ৪৩ জন ইণ্ডিয়ান এবং বাকি ৩৮ জন বর্ণ সঙ্কর মিশ্র জাতি। আজাটেক ইণ্ডিয়ান জাতিকে জয় করিবার পর ক্রমে ক্রাম আধুনিক মেক্সিকো জাতির উদ্ভব। বর্ত্তমান মেক্সিকান জাতির আচার ব্যবহারে এখনও আজাটেক জাতির সভ্যতার প্রভাব রহিয়া গিয়াছে।

মেক্সিকোর শ্বেতজাতির শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ইউরোপের অনুযায়ী। নারীদিগের মনের গতি ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গীদিগের মত। এই মেক্সিকো বাসী শ্বেতজাতি বলিতে ইণ্ডিয়ান ও স্প্যানিয়ার্ডদিগের সংমিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাদিগকেই বুঝায়। যে সব ইণ্ডিয়ান বিদেশীর সহিত সংস্রব বাঁচাইয়া রহিয়াছে তাহারাই ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত হয়।

মেক্সিকান পুরুষ সাধারণতঃ কর্ম্মবিমুখ অলস। কিন্তু নারীরা অত্যন্ত কর্ম্মনিপুণ। মেক্সিকান জাতি অত্যন্ত পুষ্প-প্রিয়। পুরুষ এবং নারী পুষ্পের বিশেষ ভক্ত। এজন্য প্রত্যেক মেক্সিকান গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান

থাকিবেই। পূর্ব্বপুরুষ আজাটেক জাতির নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে মেক্সিকান জাতি এত পুষ্প-প্রিয় হইয়াছে।

নারীজাতি অনুক্ষণ কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। তাহারা বাজারে তরীতরকারী হাঁসমুর্গী সর্ব্ববিধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে যায়। বর্ত্তমান প্রগতি যুগেও ইহার ব্যতিক্রম নাই।

পুরুষরা রাত্রিকালে বাহিরে প্রাঙ্গনে বা গাছতলায় শয়ন করে। নারীরা গৃহ মধ্যে শয়ন করে, কিন্তু শয্যার বালাই নাই। একখানা মাদুরই তাহাদের কাছে পর্য্যাপ্ত।

মেক্সিকোয় কূপের পানীয় জলের অভাব। এজন্য পুরুষ ও নারী ভিস্তীর কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জনও করিয়া থাকে। কলসীই জল বহিবার পক্ষে প্রশস্ত। চামড়ার থলীতে জল বহিবার ব্যবস্থা নাই।

নিম্নশ্রেণীর মেক্সিকানদিগের মধ্যে রোগের চিকিৎসার ভার নারীদিগের উপর। তাহাদের সে চিকিৎসা প্রণালী এই বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। তুকতাক এ যুগেও সমধিক প্রবল।

আদিম ইণ্ডিয়ান জাতির নারীরা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে। শিশুসন্তান পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া মাথায় মোট লইয়া বিকিকিনি করিতে যাওয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দেও সমভাবে প্রচলিত। মেক্সিকোয় প্রচুর তামাক উৎপাদিত হয়। তামাকের ক্ষেত্রে পুরুষদিগের সহিত নারীরা সমভাবে কাজ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তামাকের চারা পোকায় নষ্ট না করে, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করে নারীরাই। মাদুর চ্যাটাই, ঝোড়া বয়নের কার্য্য মেয়েদের একচেটিয়া।

মেক্সিকোর পশ্চিমাঞ্চলে এখনও দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর অত্যাচার প্রবল। এই অশ্বারূঢ় দস্যুদলে নারীও আছে। অশ্বারোহণে তাহাদের দক্ষতা

অসামান্য। সাহসে তাহারা পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে না। ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা খুবই কম। সুতরাং বর্ত্তমান প্রগতি যুগেও তাহারা বর্ব্বরতা ত্যাগ করিতে পারে নাই।

মেক্সিকান নারীরা মাটীর খেলানা প্রস্তুত করিতে বিশেষ নিপুণা। আমেরিকায় এই সব ক্রীড়নকের চাহিদা প্রচুর।

আদিম ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে ধনী দরিদ্র দুইই আছে। ধনী ঘরের নারীরা মান ইজ্জৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক। পথে চলিবার সময় ধনীর গৃহিণী বা দুলালীরা সঙ্গে দাসদাসী না লইয়া বাহির হন না। এদেশের নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের কাছে পিস্তল, ছোরা, বন্দুক সর্ব্বক্ষণ থাকে। দস্যু ভীতির জন্যই এই ব্যবস্থা।

মেক্সিকান নারীরা কোন কোন অঞ্চলে তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। নারীদিগের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে প্রাচীন আজাটেক জাতির বিশেষ আগ্রহ ছিল। এখনও তাহার অবশেষ দেখা যায়। তবে পাঠশালায় পড়া ছাড়া শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয় না।

ইণ্ডিয়ানরা অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও, তাহাদের ঘরের নারীরা সদা-হাস্যময়ী। মনে দুঃখ, অসন্তোষের ছায়া দেখা যায় না। পরিচ্ছন্নতার দিকে নারীদিগের বিশেষ দৃষ্টি আছে। সাবান না জুটিলেও প্রত্যহ মেয়েরা, কাপড় কাচিয়া থাকে। কেশরাজিতে ফুল, পাতা, পেঁয়াজ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহারা রূপসজ্জা করিয়া থাকে। ইহাদের পরিধানে সাধারণতঃ ছোট স্কার্ট এবং মাথায় ওড়না। ওড়না মাথায় না দিয়া কোনও নারী পথে বাহির হয় না।

মেক্সিকোর অশিক্ষিত ও দরিদ্র আদিম নিবাসী নারীদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্বেতাঙ্গ জাতির সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, মেক্সিকান শ্বেতাঙ্গীরা আমোদ প্রমোদে নিপুণা। নৃত্য গীত,

হাস্য পরিহাসে তাঁহারা কাহারও অপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া নাই। পুরুষের ন্যায় নারীরাও শিক্ষিত এবং সভ্য। কার্য্যে উৎসাহেরও অভাব নাই। শ্বেতাঙ্গ মেক্সিকান নারীরা গৃহস্থালীর সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহারা আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেও বিশেষ হিসাবী। দাস দাসী প্রভুপত্নীকে ঠকাইবে সে উপায় নাই। সমস্তই তাঁহারা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

গৃহসজ্জা সুশৃঙ্খলে সুবিন্যস্ত যাহাতে থাকে সেদিকে শ্বেতাঙ্গনারীরা খরদৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। রন্ধনশালার অবস্থাও অনুরূপ। গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদন, পুত্রকন্যার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সম্বন্ধে নারীরা সবিশেষ অবহিত। কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তারপর নৃত্যগীত ক্রীড়া কৌতুক নৌ-বিহার প্রভৃতিতে যোগ দিয়া থাকেন। শরীরের সৌন্দর্য্য যাহাতে অমলিন থাকে, প্রসাধনে কোনও ত্রুটি না ঘটে, এ সকল বিষয়ে মেক্সিকান শ্বেতাঙ্গ নারীর বিশেষ লক্ষ্য আছে। তাই মেক্সিকান সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। মেয়েরা বেশবল ক্রীড়ার বিশেষ অনুরাগিণী, নৌ বিহারেও তাঁহাদের সমধিক আগ্রহ, কিন্তু তাস ক্রীড়ার ভক্ত তাঁহারা নহেন।

নৃত্যগীতে মেক্সিকান শ্বেতাঙ্গীরা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মেক্সিকোর লীলানৃত্য সকল সভ্য দেশে সমাদৃত। সেই নৃত্যের ইহাই বিশেষত্ব যে, বসনে রঙ্গের বাহার, নৃত্যে রসসৃষ্টি এবং অপূর্ব্ব কৌশল সত্ত্বেও নির্লজ্জ অঙ্গবিলাস নাই। মেক্সিকোর তরুণী ব্যাঞ্জোবাদ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন।

মেক্সিকোর শ্বেতাঙ্গীদিগের বেশভূষা একটু বিচিত্র। আধুনিক প্যারিস ফ্যাসানের সঙ্গে প্রাচীন স্পেনিশ ফ্যাসান মিশাইয়া তাঁহাদের পরিচ্ছদ-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মেক্সিকোর বিবাহ-রীতি ইউরোপীয় সমাজের বিবাহ-রীতির অনুরূপ। প্রণয় জন্মিবার পর বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু স্বয়ং নির্ব্বাচিত পাত্রে এখনও তরুণীরা আত্মসমর্পণ করিতে পান না। অভিভাবকরাই এ যুগেও পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া থাকেন। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা খুবই অল্প। এ বিষয়ে মেক্সিকো অত্যন্ত রক্ষণশীল। প্রগতি যুগের হাওয়ায় এখনও প্রাচীন আদর্শ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই।

মেক্সিকোর নারীসমাজ কিছু জিঘাংসা-প্রিয়। নারী-রক্তে একটা তীব্রতা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। যদি কোনও মেক্সিকান নারীর কাছে কেহ কোন দোষ করিয়া ফেলে এবং সেই দোষের ফলে নারীর মনে আক্রোশ জাগে, তাহা হইলে অপরাধীর রক্ত দর্শন না করিয়া সে আক্রোশ চরিতার্থ হয় না। এ যুগেও মেক্সিকান নারী অস্ত্রমুখে প্রেমনৈরাশ্যের তীব্র দহন জ্বালা মিটাইয়া থাকে। আইন আদালতের শরণ লওয়া তাহারা গৌরব-জনক মনে করে না। প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ মহিমা মেক্সিকান নারী বুঝে—গভীর প্রেম মেক্সিকান নারীর অস্থিমজ্জাগত, কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে সেই প্রেমে হলাহল মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে মেক্সিকান নারী ভীমা ভৈরবীরূপে অস্ত্রপাণি হয়। এই স্বভাব তাহাদের প্রকৃতিগত। পূর্ব্বপুরুষদিগের রক্তে যে জিঘাংসা প্রবৃত্তি ছিল—স্পেনিশ ও আজটেক জাতির শোণিতে যে ক্ষমাহীন উগ্রতা ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে আধুনিকা মেক্সিকান নারী তাহা লাভ করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয় ললনা

অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষাকৃত নূতন সভ্যদেশ হইলেও অত্যন্ত অভ্যুদয়শীল। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশ সভ্য জগতে অপরিজ্ঞাত ছিল। কোনও সভ্য মানব তখন এ দেশে পদার্পণ করেন নাই। সে যুগে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে মরুভূমিতে আদিম কৃষ্ণকায় মানব গর্ত্ত খনন করিত এবং প্রাচীন বক্র প্রহরণের সাহায্যে ক্যাঙ্গারু শিকার করিয়া বেড়াইত।

বৃটিশ জাতির চেষ্টায় এই "কমনওয়েলথের" সৃষ্টি। এখন ৭০ লক্ষ লোক অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। তন্মধ্যে শতকরা ৯৭ জন বৃটিশ শোণিত জাত।

অষ্ট্রেলিয়ার আয়তন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ। অল্পদিনের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সহরগুলি নরনারীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া মার্কিণের আদর্শে গঠিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং নারীদিগের মধ্যে মার্কিণ সভ্যতার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় দ্রুত শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। পুরুষদিগের ন্যায় নারীরাও শিক্ষায় অগ্রণী। নারীরাও পুরুষদিগের মত ক্রীড়ানুরাগিণী। পুরুষ ও নারী সমান উৎসাহে সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকে।

যুবকগণ পানসী ও ডিঙ্গী চড়িয়া নদীবক্ষে বিহার করে। তাহাদের তরুণী বান্ধবীরা ছাতি মাথায় দিয়া রেশমী পরিচ্ছদে রেশমী গদিতে বসিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার নারীরা সাধারণতঃ খাট স্কার্ট পরিধান করিয়া থাকে। উৎসব দিনে সুন্দর পরিচ্ছদ ভূষিতা তরুণীরা একএক দলে ৩।৪ জন মিলিয়া নদীতীরস্থ পথের উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। "মিস হেন্‌রী" দিবস বলিয়া বৎসরে একটি রূপসী মেলা বসিয়া থাকে। সেই মেলায় অসংখ্য তরুণী যোগ দেয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া যে সুন্দরী নির্ব্বাচিত হইবে, সেই সৌন্দর্য্যের পূজা পাইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় নারীরা বৃটিশ নারীদিগের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রবর্ত্তিনী। রক্ষণশীলতার বালাই তাহাদের মধ্যে অল্প। অবাধে নারীরা পুরুষদিগের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকে। মার্কিণ জীবন যাত্রার প্রণালীর অনুকরণে তাহাদের উৎসাহ সমধিক।

বিবাহ বিধি অবশ্যই প্রচলিত আছে এবং খৃষ্টান ধর্ম্মানুসারে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অষ্ট্রেলিয়ায় অল্প নহে।

নারীরা যেমন বিদ্যাশিক্ষা, ক্রীড়া কৌতুকে অগ্রগণ্যা, তেমনই শারীরিক ব্যায়াম, শিকারাদি ব্যাপারেও কম উৎসাহশীলা নহে। প্রগতিবাদ অষ্ট্রেলিয়ায় বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে।

সিনেমা দর্শনে তরুণীদিগের আগ্রহ সমধিক। গির্জ্জা ও ধর্ম্মের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, অষ্ট্রেলীয় নারীরা এই বৈজ্ঞানিক যুগে উপাসনার জন্য গির্জ্জায় যাওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া সাধারণতঃ মনে করে না।

বহু নারী বিমান পরিচালনায় ব্রতী হইয়াছেন। নারী পুরুষের সঙ্গিনী, একথাটা এখানকার নারী জীবনযাত্রার প্রণালীতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

পুষ্প প্রচুর পরিমাণে এই সকল অঞ্চলে পাওয়া যায়। নারীরা অত্যন্ত পুষ্প-প্রিয়।

আফগান নারী

আফগানীস্থান সহজগম্য স্থান নহে। সকলের প্রবেশ এখানে অনুমোদিত নহে। আফগানজাতি স্বতন্ত্র থাকিবার পক্ষপাতী। রাজা আমানুল্লা প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বদেশে সকল প্রকার পরিবর্ত্তন আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিক্ষিতা, প্রতীচ্য আবহাওয়ায় প্রতিপালিতা, রাণী সৌরিয়া সহ অবশেষে তিনি আফগানীস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

আফগানীস্থানে অবগুণ্ঠনের বিশেষ প্রচলন। নারীর মুখ সৌন্দর্য্য সেখানে পর পুরুষের দর্শন করিবার উপায় নাই।

রাণী সৌরিয়া ও রাজা আমানুল্লা পর্দ্দা প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রাম্য বালিকাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য পুরাতনপন্থী আফগানের সংখ্যাই অধিক। তাহারা আপত্তি তুলিয়াছিল।

রাণী সৌরিয়া কাবুলে অবগুণ্ঠনহীনা হইয়া প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে ভোজন করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। চরম পন্থীরা ইহাতে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিল।

বেশভূষার পরিবর্ত্তনেও রাজা আমানুল্লা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতেও আফগানরা পাগড়ী ত্যাগ করে নাই—নারীদিগের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় নাই। আফগানীস্থানে কন্যার বিবাহে পিতামাতারই

পছন্দ চূড়ান্ত। কিশোরী ও যুবতী বিবাহ সে দেশে প্রচলিত। কিন্তু পাত্রীর নির্ব্বাচিত পাত্রে বিবাহ দিবার বিধি নাই। কারণ, নারীর পতি নির্ব্বাচনে অধিকার নাই।

রাজা আমানুল্লা বিবাহকালে পাত্রীর বিনা অনুমোদনে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার এই সিদ্ধান্তের অনুমোদনও করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে একটা অসন্তোষের যে উদ্ভব না হইয়াছিল তাহা নহে।

ব্যভিচার আফগানীস্থানে চলে না। ব্যভিচারের শাস্তি অতি কঠোর। প্রকাশ্য রাজপথে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থাও ছিল।

আফগান নারীরা লেখাপড়া করিয়া থাকে, তবে সহরে যতটা চলে গ্রামে তাহা চলে না। আফগাননারীরা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া পথে ঘাটে বাহির হয়। তাহাতে আপত্তি নাই।

আফগান নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল। ধর্ম্ম চর্চ্চার দিকে অনেকেরই আসক্তি আছে। মুসলমান সমাজের অনেক প্রথা আফগানীস্থানে প্রচলিত। আতিথেয়তার প্রতি আফগান নারীরাও অবহিত।

অবাধ পুরুষ সংস্রবে আফগান নারীদিগের আসিবার প্রথা নাই। মাতৃত্বের বেদনা, তাহাদের মধ্যে প্রবল। স্বামী ও সন্তানদিগের জন্য আফগান নারীদিগের দরদ সমধিক।

বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক দিবার প্রথা বিদ্যমান। আফগান নারী সম্বন্ধে অনেক কিছু এখনও বাহিরের জগৎ জানিতে পারে নাই। শীঘ্র পারিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

সিংহল-কামিনী

সিংহল ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভারতীয় দ্বীপ। ত্রেতার স্বর্ণলঙ্কা এইখানে ছিল। এই দ্বীপ ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ, মণিরত্ন এখনও প্রচুর মিলিয়া থাকে। ত্রেতার কথা এখন পুরাণের অন্তর্গত। ঐতিহাসিকগণ গবেষণায় স্থির করিয়াছেন, এই দেশের আদিম অধিবাসীর নাম বেদ্দা জাতি।

তামিলীরা সিংহলে অভিযান করিলে, বেদ্দা জাতি অরণ্যের মধ্যে গিয়া নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তারপর বৃটিশ অধিকার সিংহলে ব্যাপ্ত হইল। বেদ্দা জাতি এখনও অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে।

ইউরোপীয় বহু জাতি, বৃটিশদিগের পূর্ব্বে সিংহলে অভিযান করিয়াছিল। পোর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকে। প্রতীচ্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলে, এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসী বেদ্দা, তামিলী হিন্দু ও মুসলমান। সিংহলী মুসলমানরা প্রকৃত প্রস্তাবে মূরজাতি। বাণিজ্য ব্যপদেশে যে সকল আরব বণিক দীর্ঘকাল ধরিয়া এখানে বাস করিতেছে, এই সকল মুসলমান তাহাদিগেরই বংশধর।

সিংহলী মুসলমান নারী ব্যতীত এখানকার কোনও সম্প্রদায়ের নারী পর্দ্দা প্রথা মানিয়া চলে না। পথে, বাজারে নারীর মেলা পুরুষদিগেরই মত দেখিতে পাওয়া যাইবে। কলকারখানায় মেয়ে শ্রমিকের অভাব

নাই। হাটে বাজারে তরিতরকারী লইয়া নারীরা অসঙ্কোচে বিক্রয় করিতে যায়। রবারের ক্ষেত, চা-বাগান, সকল স্থানেই নারী শ্রমিক দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পর্দ্দা প্রথার প্রচলন না থাকিলেও শিক্ষিত গৃহস্থ বা অভিজাত বংশীয়, সিংহলনারীরা সাধারণতঃ পথে বাহির হন না। দ্বাদশী কুমারী হইতে উর্দ্ধ বয়স্কারা রিকসা বা অন্য প্রকার যানে আরোহণ করিয়া তবে বাড়ীর বাহির হইয়া থাকন। পদব্রজে পথ চলায় সমাজে নিন্দা ঘটিয়া থাকে বলিয়া এই প্রথা সিংহলের শিক্ষিত গৃহস্থ ও অভিজাত সম্প্রদায়ে প্রচলিত।

সিংহল নারীর বিবাহের বয়স সাধারণতঃ দ্বাদশ হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত। কোনও বিবাহিতা নারী একা পথে বাহির হন না। হয় কোনও দাসী অথবা বর্ষিয়সী আত্মীয়াকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে বাহির হইতে হয়। বিবাহিতা নারীর গৃহই সর্ব্বস্ব। গৃহস্থালীর নানা কাজে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতে হয়। বাহিরে আমোদ প্রমোদ করিবার অবসর অত্যন্ত অল্প। গৃহ সংসারের কাজেই নারীর চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

সিংহলে বহু জাতীয় লোকের বাস, সুতরাং তদনুসারে রীতি নীতি আচার এবং বেশ ভূষায়ও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। অনেকদিন ধরিয়া একত্র বাস করিয়াও কোনও জাতির স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয় নাই। সিংহলী, তামিলী, মুর এবং বার্জ্জার (ওলন্দাজ বংশ সম্ভূত ফিরিঙ্গী) এই চারিটি জাতি ব্যতীত, মলয়, আফগান এবং পার্শী জাতীয় বহুলোক সিংহলে আছে। কিন্তু এই সকল জাতির নারী হিসাবে আলোচনার মত কিছু নাই বলিলেই চলে।

বেদ্দা জাতির নারীদিগের কথা আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, ইহারা অরণ্যে বাস করে। সুতরাং শিক্ষা বা সভ্যতার

সহিত তাহাদের সংস্রব অল্প। পৃথিবীর কোনও সংবাদই তাহাদের কাছে পৌঁছে না। এখনও বৃক্ষ কোটরে বাস, তরু পল্লবের সাহায্যে যে পরিধেয় হয়, তাহাতেই লজ্জা নিবারণ করিতে হয়।

বর্ব্বর বেদ্দা জাতির মধ্যে কিন্তু বহু বিবাহ নাই। বেদ্দা নারীরা পতিব্রতা, সাধ্বী। প্রাণ দিয়া স্বামিপুত্রকে ইহারা ভালবাসে। ইদানীং বহু বেদ্দা নরনারী উদরান্ন সংস্থানের আশায় সিংহলী ও তামিলীদিগের গৃহে আসিয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। তাহার ফলে আচার রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহারা আত্মবৈশিষ্ট্য হারাইতেছে।

সিংহলী তামিলীদিগের অনেকেই চা বাগানে কুলীর কাজ করে। কয়েক ঘর অভিজাতবংশের তামিলীও সিংহলে বাস করেন। তাঁহাদের ঘরের নারীরা সুদর্শনা। শিক্ষিতা নারীদিগের ব্যবহার বিনয়-নম্র, মধুর। প্রতীচ্য শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে তামিলী ঘরের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিতেছেন। তামিলী নারীদিগের বেশভূষা ভারতীয়া নারীদিগেরই অনুরূপ। অলঙ্কার পরিধান করার তাঁহারা পক্ষপাতিনী। তাগা, বালা, চূড়ী, কর্ণে ইয়ারিং, কণ্ঠে মণিরত্নের মালা, পদনখে চুটকি, নাসায় নোলক, নথ, ললাটে অলঙ্কার, কেশে মালা, তাঁহাদিগের ভূষণ।

সিংহলী মুসলমান সমাজে, আট দশ বৎসরের বালিকা যবনিকার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবরোধ প্রথার তীব্রতা খুব বেশী। এজন্য শিক্ষা ঐ বয়স হইতেই সমাপ্ত হয়। অবরোধের কারা প্রাচীরের অন্তরালে সিংহলী মুসলমান নারীর জীবন অতিবাহিত হয়।

ইহাদের বিবাহে নানাবিধ আচারের সমারোহ আছে। পুরুষরা উপবাস করে। বিবাহের কন্যা গহনার ভারে আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকে। স্বামীর কথায় পুরপত্নীকে চলাফেরা ওঠা বসা পর্য্যন্ত করিতে হয়। নারীর

স্বাতন্ত্র্য সেখানে নাই। সন্তান হইলে যদি পুত্র হয়, তবে যতদিন সে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে না পারে ততদিন মাতার সহিত তাহার সম্পর্ক। তারপর মাতা শুধু অবরোধে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করে।

নব বিবাহিতা বধূর শিক্ষার ভার শ্বশ্রূমাতার হাতে। স্বেচ্ছামত, কোনও কাজ করিবার অধিকার তাহার নাই। খেয়ালমত সীবনকার্য্য, গীতবাদ্য বা চিত্রাঙ্কণ গ্রন্থপাঠ—এসব বালাই সিংহলের মুসলমান নারীর নাই।

অধিকাংশ মুর নারীই সুন্দরী। কিন্তু মুর সমাজে স্থূলাঙ্গী নারীর সমাদর অধিক বলিয়া এ বিষয়ে বিবাহের পর হইতেই কঠোর সাধনা চলিতে থাকে। এজন্য বিংশতীবর্ষীয়া মুরনারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাংস-পিণ্ডের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।

মুরনারীদিগের উপর পুরুষের কিন্তু অত্যাচার নাই। এজন্য মুরনারীরা বর্ত্তমান প্রগতিযুগেও সংস্কারবশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাবজনিত বেদনা অনুভব করেন না।

বার্জার জাতি ওলন্দাজ ও পোর্ত্তুগীজ রক্তের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এই সম্প্রদায়ের নারীরাও পুরুষদিগের মত উদ্যমশীল, উৎসাহী এবং উদ্যোগী। শিক্ষায় দীক্ষায় ইহাদের উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। এই জাতির নারীরা স্কুলে শিক্ষকতা করেন, চিত্র সঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলার সাধনায়ও ইঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

আদিম সিংহলী বা সিংহজাতি যেমন সবল, তেমনই পরিশ্রমী। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সিংহলী সমাজে বহু বিবাহ প্রথা নাই। বহুপূর্ব্বে নারী সমাজে বহু পতিত্ব প্রথা বিদ্যমান ছিল, এখন নাই। কাণ্ডির মেয়েদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা এখনও দেখা যায় বটে, কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সহিত তাহা বিলুপ্ত হইতেছে।

সিংহলী জাতির মধ্যে দুই প্রকার বিবাহ প্রথা আছে—দিগা ও বীণা। দিগা পদ্ধতি অনুসারে স্ত্রী, স্বামীর সহিত ঘর করিবার জন্য স্বামীর আলয়ে আইসে। বীণা রীতি অনুসারে স্বামী স্ত্রীর গৃহেই বসবাস করিতে গমন করে। এই শ্রেণীর স্বামী স্ত্রীর অনুকম্পার উপরেই নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। স্ত্রীর মন রাখিয়া চলিতে না পারিলে স্ত্রী স্বামীকে তাড়াইয়া দিতে পারে। বীণাদলের স্ত্রী সম্পত্তির মালিক।

সিংহলী সমাজে বাল্যবিবাহ নাই। ষোল সতেরো বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঘটকঘটকীর মারফতে বিবাহ হইত। এখন সে ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে। এখন রেজেষ্ট্রি আপিসে গিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। কিন্তু একটি প্রথা এখনও বিদ্যমান আছে—রেশমী সূত্রদ্বারা বর কন্যার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পুরোহিত সেই সময় বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পুরোহিত কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহেন। বৌদ্ধ পুরোহিতের দল চিরকুমার বলিয়া বিবাহাদি অনুষ্ঠানে তাঁহাদের সংস্রব রাখা শাস্ত্র-বিগর্হিত ব্যাপার।

বিবাহকালে বাদ্যভাণ্ডের প্রচুর আয়োজন হয়। আত্মীয়কুটুম্বকে আহ্বান করিয়া সমারোহে ভোজক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। নারিকেল পত্রের দ্বারা গৃহসজ্জা করা বিধি। নারিকেলপত্র সিংহলী সমাজে কল্যাণের দ্যোতক। প্রত্যেক শুভকার্য্যে নারিকেল পত্রের সংযোগ থাকিবেই।

সিংহল নারীরা সুকেশা। সিংহলে নারিকেল প্রচুর। মেয়েরা নারিকেলের সাহায্যে বিবিধ খাদ্য রচনা করিয়া থাকে।

সিংহলী সংসারে সন্তান ব্যতীত স্বামীকেও নিত্য স্নান করানের প্রথা বিদ্যমান। মেয়েরা কদাচিৎ বডিস, জ্যাকেট ব্যবহার করে। একখানি সুদীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডে সর্ব্বাঙ্গ পরিপাটিরূপে আচ্ছন্ন করা হইয়া থাকে। সিংহলী

মেয়েরা তামিলী নারীদিগের মত অঙ্গে অলঙ্কারের বোঝা ধারণ করে না।

তাম্বুলের আদর সিংহলী সমাজে অধিক। পর্দ্দা প্রথা এ সমাজে নাই বলিয়া মেয়েরা সুশিক্ষালাভ করিয়া থাকে। গ্রামে গ্রামে বহু বিদ্যালয় হইয়াছে। মেয়েরা শিক্ষার জন্য সমধিক উৎসুক। উচ্চশিক্ষাও দ্রুত চলিয়াছে।

শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও সিংহলী নারীসমাজে ভূতপ্রেত, তন্ত্রমন্ত্র, তুক-তাকের প্রভাব অসামান্য। বর্ত্তমান প্রগতিযুগেও এসকল কুসংস্কার হইতে তাহারা মুক্ত নহে।

ভারতের নারী

ভারতবর্ষের নারীর পরিচয় ভারতীয়গণের কাছে অভিনব নহে। বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষ একাদশটি প্রদেশে বিভক্ত। অবশ্য রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া বর্ত্তমান বৃটিশ সরকার এই বিভাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মান্দ্রাজ, বোম্বাই মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব ও সিন্ধু এই একাদশটি প্রদেশ লইয়া বৃটিশ ভারতবর্ষ। ইহা ছাড়া নেপাল, ভুটান, কাশ্মীর, রাজপুতানা, মহীশূর প্রভৃতি স্বাধীন ও করদ রাজ্য সমূহ আছে।

বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান যুগে, সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে নারী জাগরণ ও নারী প্রগতি দেখা দিয়াছে। নারী সম্বন্ধে যে ধারণা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক বিষয়ে দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষের নারী অবস্থা বিশেষে এতদিন অন্তঃপুরের অন্তরালেই আবদ্ধ থাকিতেন; কিন্তু যুগপরিবর্ত্তনে, ইদানীং সে কুপ-মণ্ডুকতা অনেকেই পরিহার করিয়া বহির্জগতের আলোকে ও মুক্ত বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জ্ঞানলাভের স্পৃহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নারী সমাজে পরিলক্ষিত হইতেছে।

নারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে বিদ্যমান ছিল। নারী অজ্ঞতার অন্ধকারে মগ্ন হইয়া থাকিলে

সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ দুর্ব্বল ও অপুষ্ট হইয়া যায়। তাই ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ।"

ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগে ভারতীয়গণ আদর্শ শিক্ষার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। তাই নারীর ব্যাপক শিক্ষার নানা প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছিল। কিন্তু কালধর্ম্মে ভারতবাসীরা বুঝিতে শিখিয়াছে, নারীর সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তাই প্রাচীন পন্থী ও নব্যতন্ত্রী সকলেই নারীর শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তবে শিক্ষা দীক্ষায় প্রকারভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন, আর্য্য সভ্যতার ও শিক্ষা-দীক্ষার অনুযায়ী করিয়া—দেশের সনাতন ভাবধারার অক্ষুন্নতা রক্ষা করিয়া নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। অপর পক্ষ বলেন যে, নারী জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভের উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে। অবশ্য ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যেই এই দুই ভাবধারা বিদ্যমান।

প্রথমেই বাঙ্গালার কথা ধরা যাউক। বাঙ্গালার হিন্দুরা (প্রাচীন ও নব্যতন্ত্রী) যতদূর অগ্রগামী, মুসলমান সমাজ তেমন নহেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রক্ষণশীলতার বিশেষ পক্ষপাতী। কেহ কেহ এমন আছেন যে, নারীদিগকে এখনও বোরখায় ও অবরোধে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন—বাহিরের মুক্ত আলোক ও বাতাসে নারীজাতিকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহেন।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ হিন্দুরই এই বিশ্বাস যে, এদেশে অবরোধ থাকা সঙ্গত নহে। তবে অন্তঃপুর চাই এবং অন্তপুরের শুচিতা, বিশুদ্ধতা রক্ষিত হওয়া সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়। নারীর শিক্ষা ও অধিকার সম্বন্ধেও তাঁহারা দেশ ও কালোপযোগী ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে চাহেন।

বিলাতের রাজপথে উচ্চশিক্ষিতা ভারতীয় মহিলা

বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীশিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক হইয়াছে সত্য কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে তাহা যৎসামান্য। বড় বড় সহরে এবং পল্লীর সহরে, হিন্দু ও মুসলমান বালিকারা বিদ্যালয়ে অথবা কলেজে বিদ্যার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামের মেয়েদিগকে এখনও অনেকক্ষেত্রে অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবনযাপন করিতে হইতেছে।

বাঙ্গালার বড় বড় সহরে মেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আয়ত্ত করিতেছে। নৃত্য, গীত ও কারুশিল্পশিক্ষায় এ যুগের মেয়েরা অনেকেই অগ্রণী। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম—সকল সম্প্রদায়ের সহরবাসিনী তরুণীরা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছেন। উচ্চশিক্ষায় বহু তরুণীই প্রশংসা ও কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতেছেন। অবশ্য মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার তেমন প্রসার লাভ না করিলেও, অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের নারী উচ্চশিক্ষার অধিকারিণী হইতেছেন।

বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাশ হওয়ায় চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কোনও কন্যার বিবাহ আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত এবং উন্নত সমাজে এই বিধানের প্রয়োজনীয়তা আদৌ নাই। কারণ, অর্থনীতিক অবস্থার চাপে এ যুগে বাল্যবিবাহ বহু পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুপাত্রের অভাবে কন্যাকে বড় করিয়াই রাখিতে হয়। এখন বহু হিন্দু পরিবারেই বিংশতিবর্ষীয়া বা তদূর্দ্ধ বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা দুর্ল্লভ দর্শনা নহে।

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের বিবাহ পদ্ধতি পূর্ব্ববৎই প্রচলিত আছে। কন্যার পিতামাতা বা অভিভাবকবর্গ কন্যার জন্য যে পাত্র মনোনয়ন করেন, কন্যাকে সাধারণতঃ সেই পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিতে হয়।

মুসলমান সমাজেও সেই বিধি প্রচলিত। অবশ্য খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজে মনোনয়ন প্রথা বিদ্যমান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকবর্গের—পিতামাতার অভিমতানুসারেই উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তবে পাত্রী স্বয়ম্বরা যে কোন কোন ক্ষেত্রে না হইতেছে, তাহা নহে। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে কন্যার মনে স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা যে ক্ষেত্রে প্রবল হইয়া উঠে. সেইরূপ ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা নিয়ম নহে—ব্যতিক্রম মাত্র।

ইদানীং অন্যের বিবাহিতা পত্নী, মনোনীত অপর পাত্রের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। প্রধানতঃ মুসলমান ধর্ম্ম সাময়িকভাবে গ্রহণ করিয়া স্বামীকে সেই ধর্ম্মানুসারে চলিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। স্বামী তাহাতে সম্মত না হইলে তালাকনামার আশ্রয়ে পূর্ব্ব বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তারপর সেই নারী মনোনীত পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে। অবশ্য রেজেষ্ট্রী করিয়া অন্যধর্ম্মমতে সে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবের অনেকগুলি বিবাহ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বাঙ্গালী নরনারীর মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার নারীসমাজ সহরে যেরূপ, পল্লীঅঞ্চলে তদ্রূপ নহে। সহরে বাঙ্গালী নারীর মধ্যে শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী হিন্দুধর্ম্মানুরাগিনী অসংখ্য না আছেন। আবার অন্যবিধ নারীরও অভাব নাই। শিক্ষাদীক্ষার একই পর্য্যা থাকিয়া বিভিন্ন মনোবৃত্তিধারা তাঁহাদের কার্য্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে

বাঙ্গালার নারী সাধারণতঃ দেবদ্বিজে ভক্তিমতী এখনও আছেন বহু শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিতা হিন্দু নারী আচারনিষ্ঠায় এখনও তাঁহাদে পূর্ব্বপুরুষগণের পথে বিচরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বহু বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ না হইলে একপত্নীত্ব সাধারণ নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। এজন্য বর্ত্তমানযুগের না

সাধারণতঃ সপত্নীত্ব সহ্য করিবার মত মনোবৃত্তি পরিহার করিয়াছেন।

বিবাহবিচ্ছেদ আইন রচনা করিবার খেয়াল এবং চেষ্টা চলিলেও এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে সে আইন রচনার অবকাশ আসে নাই। সাধারণ হিন্দুনারী বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষপাতিনী নহেন। সহরে ও পল্লীতে সর্ব্বত্রই এই সাধারণ মনোবৃত্তির প্রকাশ প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হইবে।

পণপ্রথার প্রাবল্য বাঙ্গালাদেশের উন্নত সমাজে পূর্ব্ববৎই বিদ্যমান। এই প্রথা লোপের চেষ্টাসত্ত্বেও কন্যাদান সম্পর্কে বহু পরিবারকে শোচনীয় দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হয়। সেজন্য আধুনিকা বাঙ্গালী নারীর মনে একটা বিদ্রোহ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। পণপ্রথার যুপকাষ্ঠে বলিরূপে বহু তরুণীকে উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থায়, তরুণী সমাজে আত্মহত্যার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

বাঙ্গালার বহু শিক্ষিতা নারী জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তন্মধ্যে শিক্ষয়িত্রী এবং ধাত্রীর কার্য্যের জন্যই অনেকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে বঙ্গ মহিলারা দলে দলে যোগদান করিতেছেন। কংগ্রেসের কার্য্যে অনেক তরুণী কারা-বরণ করিয়াছেন। শিক্ষায় যাঁহারা অগ্রসর তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাউন্সিল ও কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতেছেন।

সহরের নারী সমাজে এখন অবরোধ প্রথার তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। ট্রামে, বাসে, সিনেমায় নারীরা অকুন্ঠিতভাবে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

অন্যান্য শিল্পকলা শিক্ষার সঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চাও হিন্দু বালিকাদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। শরীরে শক্তি ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা নারী সমাজ বুঝিতে শিখিতেছেন। মুসলমান সমাজে অবশ্য এ প্রথা এখনও আদর লাভ করে নাই। হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি সমাজের বালিকা ও তরুণীরা ব্যায়ামে দক্ষতা লাভও করিতেছেন।

বাঙ্গালার বহু মহিলা উচ্চ বিদ্যা আয়ত্ত করিতেছেন। আইন বিদ্যাও তাঁহারা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক মহিলা চিকিৎসক এ যুগে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রতীচ্য ফ্যাসন এ যুগের নারীকে মুগ্ধ করিয়াছে সুতরাং সহরে বিলাসিনী নারীর অভাব নাই। খণ্ডিতকেশা তরুণীও দুর্ল্লভদর্শনা নহে।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অনেক কিছুই সহরবাসিনী বর্ত্তমান শিক্ষিতা তরুণীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে। নারী এখন চেলীর পুঁটলি হইয়া থাকিতে চাহে না। রেল, ষ্টীমার, বাস, ট্রাম গাড়ীতে তাহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

সহর ও পল্লীর নারী সমাজের পার্থক্য এখনও প্রচুর। লেখাপড়ার চর্চ্চা পল্লীর নারীদিগের মধ্যে অল্পাধিক দেখিতে পাওয়া গেলেও উভয় স্থানের বালিকা, কিশোরী, তরুণী ও প্রবীণাদিগের মধ্যে বিভিন্নতা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইবে।

উড়িষ্যা

উড়িষ্যার নারী সমাজে শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হইলেও, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই তাহা প্রধানতঃ নিবদ্ধ। পল্লীগ্রামের নারীদিগের মধ্যে উহার প্রসার তেমন হয় নাই।

উড়িষ্যার পর্দ্দা প্রথা তেমন প্রচণ্ড নহে। নারী সমাজ পথে ঘাটে অসঙ্কোচে চলাফেরা করেন। বিবাহ ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক হিন্দু আচারই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নারী সমাজ সাধারণতঃ স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজনের সেবাতেই আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি নারীদিগের মধ্যে প্রবল।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজী মহিলাদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা তেমন নাই। স্বামী বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত রাজপথে ভ্রমণ বা কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়া থাকেন। শিক্ষার প্রসার মাদ্রাজে উড়িষ্যা অপেক্ষা অধিক। তবে পল্লীগ্রামে তেমন নহে।

হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। মাদ্রাজের নারীসমাজে উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা আছেন। তাঁহারা রাজকার্য্যে এবং দেশের প্রগতি-মূলক কার্য্যে অগ্রবর্ত্তিনী। তবে প্রতীচ্য দেশের মতবাদ মাদ্রাজ নারী সমাজে তেমন সমাদৃত হয় নাই। পতিসেবা, সন্তানপালন, গার্হস্থ্য-জীবন যাপনের প্রতি অনুরাগ সমধিক।

বোম্বাই

বোম্বাই অঞ্চলের নারী সমাজ সমধিক অগ্রবর্ত্তিনী। তাঁহাদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। মহারাষ্ট্র গৃহিণী ভৃত্যের সহিত সংসারের বাজার করিতে বাহির হইয়া থাকেন। অতিথি গৃহে আসিলে, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর মহিলারা অতিথির সম্মুখে স্বচ্ছন্দচারিণী হইয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। গান শুনাইয়া আনন্দদানে তাঁহারা কৃপণতা করেন না। দেশের কল্যাণকর কার্য্যে এই অঞ্চলের মহিলা পুরোবর্ত্তিনী হইতেছেন। বহু উচ্চশিক্ষিতা মহিলা দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। মহিলা ব্যবহারাজীব, মহিলা ডাক্তার, মহিলা শিক্ষয়িত্রীর অভাব নাই।

প্রতীচ্য সভ্যতার অনুরাগিণী হইলেও, ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি মহিলাসমাজ বিগতদৃষ্টি হন নাই। হিন্দু পরিবার হিন্দুর আচারব্যবহার রক্ষায়

যত্নবতী। বিবাহ ব্যাপারে সামান্য সামান্য বৈচিত্র্য থাকিলেও মূলতঃ হিন্দু বিবাহ একই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে।

অন্যান্য প্রদেশ

পাঞ্জাব, রাজপুতনা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে অবরোধ প্রথা ভদ্রসমাজে প্রবল। পল্লীসমাজের নিম্নশ্রেণীতে অবরোধ প্রথার কঠোরতা না থাকিলেও কিছু কিছু আছে। অভিজাত গৃহের মহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগীর ন্যায় অন্তঃপুরে দিন যাপন করিয়া থাকেন।

শিক্ষার প্রসারতাও খুব অধিক নহে। অবশ্য যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু অনুপাত হিসাবে তাহা বাঙ্গালার তুলনায় অল্প। রাজনীতিক্ষেত্রে ইদানীং যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের নারীরা দেখা দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে।

হিন্দুনারীর তুলনায় এসকল অঞ্চলের মুসলমান সমাজের নারীরা অবরোধের অন্তরালে অধিকমাত্রায় দিন যাপন করিয়া থাকেন। হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি সর্ব্বত্রই প্রায় একপ্রকার। মুসলমান সমাজও বিবাহ ব্যাপারে সর্ব্বত্র সমান। তালাক দেওয়া সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রচলিত। ইদানীং কোন কোন উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পরিবারে শিক্ষিতা মহিলা দেখা দিতেছেন সত্য কিন্তু সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

বাল্যবিবাহ প্রথা যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও রাজপুতনা অঞ্চলে সমধিক প্রচলিত। সর্দ্দা আইন বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বহু বাল্যবিবাহ এখনও চলিতেছে। পণপ্রথা সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমানে বিদ্যমান।

ব্রহ্ম

ব্রহ্মদেশ এতদিন শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতবর্ষের সহিত বিভিন্ন অবস্থায় ছিল না। রাজনীতিক কারণে অধুনা ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি জাতীয়তার দিক দিয়া ব্রহ্মবাসীরা ভারতীয়গণের পরমাত্মীয়।

ব্রহ্মের নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে। অবশ্য সহরে যে পরিমাণ নারী শিক্ষা চলিতেছে, পল্লীগ্রামে তেমন নহে।

ব্রহ্ম নারীরা অবরোধ বা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করেন না। পথে, ঘাটে অবাধে ব্রহ্মনারীরা চলা ফেরা করেন। হাটে, বাজারে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম নারীর অগ্রগতি দেখা যাইবে। নারীরা সকল প্রকার বিক্রেয় দ্রব্যের বেসাতি করিয়া থাকেন।

পুষ্প ব্রহ্ম নারীর অতি প্রিয়। বসন ভূষণেও ব্রহ্ম নারীর অনুরাগ অসাধারণ। রেশমী বস্ত্রে ব্রহ্ম নারীরা আবৃত থাকিতে ভালবাসেন।

আতিথেয়তা গুণ ব্রহ্ম নারীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতিথি গৃহে আসিলে গৃহস্বামিনী তাঁহার সহিত সাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম বাসীরা সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তবে খৃষ্টান, মুসলমান ও ব্রহ্মবাসীর মধ্যে নাই এমন নহে। বিবাহ ব্যাপারে মনোনয়ন প্রথার আদর আছে। ব্রহ্ম কুমারীরা সাধারণতঃ সরলা এবং সংসারের কুটিলতা সম্বন্ধে তেমন অভিজ্ঞতা অনেকের নাই। এ জন্য সহজ বিশ্বাসে তাঁহারা অনেক সময় বিপদগ্রস্তাও হন।

বিবাহ বিচ্ছেদ ব্রহ্মদেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিতা মহিলারা সাধারণতঃ উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কৃষ্টির প্রভাব অপ্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মবাসীর জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

অনেক শিক্ষিতা ব্রহ্ম [illegible] [illegible] [illegible] কাজে আত্মনিয়োগ করিতেছেন।

সমাপ্ত